উপন্যাস

# অন্দরমহল

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

2021

# সূচিপত্র

১-২. শৈবালের ফিরতে ........ 2
৩-৪. প্রমিতার মেয়ে বাবলি ........ 28
৫-৬. অনন্তর দেশ ........ 57
৭-৮. সমাজতান্ত্রিক শৈবাল ........ 83

# ১-২. শৈবালের ফিরতে

শৈবালের ফিরতে রোজই বেশি রাত হয়। অফিস থেকে সোজাসুজি বাড়ি ফেরার ধাত নেই। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি কিংবা দু-একটা ক্লাব ঘুরে আসে। যেদিন তাসের আড্ডায় জমে যায়, সেদিন এগারোটা বেজে যায়।

এজন্য তার প্রত্যেক দিনেরই একটা বকুনির কোটা আছে। প্রমিতা তার জন্য জেগে বসে থাকে। ঝি-চাকরদের বেশি খাটাবার পক্ষপাতী নয় প্রমিতা। রান্নার লোকটিকে সে রোজ রাত দশটার সময় ছুটি দিয়ে দেয়। শৈবাল তারও পরে ফিরলে প্রমিতা নিজেই তার খাবার গরম করে দেবে, পরিবেশন করবে আর সেইসঙ্গে চলতে থাকবে বকুনি।

শৈবাল তখন দুষ্টু ছেলের মতন মুখ করে শোনে।

প্রত্যেক দিনই সে প্রতিজ্ঞা করে যে, কাল আর কিছুতেই দেরি হবে না। এক-একদিন মেজাজ খারাপ থাকলে সে অবশ্য উলটে কিছু কড়াকথা শুনিয়ে দেয় প্রমিতাকে। সাধারণত তাসে হারলেই তার এ-রকম মেজাজ খারাপ হয়।

ওদের দু-টি ছেলে-মেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে দশটার মধ্যে। সুতরাং, বাবা-মায়ের ঝগড়া তাদের শুনতে হয় না। শৈবাল প্রমিতাও প্রাণ খুলে চোখাচোখা বাক্য বিনিময় করে যেতে পারে।

সেদিন রাত্রে শৈবাল খাবার টেবিলে বসে মাছের ঝোল পর্যন্ত পৌঁচেছে, ঝগড়াও বেশ জমে উঠেছে, এইসময় সে দেখল, সতেরো-আঠেরো বছরের একটি সম্পূর্ণ অচেনা মেয়ে তাদের রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে, লাজুক ভঙ্গিতে মুখ নীচু করে হেঁটে বারান্দার দিকে চলে গেল।

বিস্ময়ে ভুরু উঁচু হয়ে গেল শৈবালের।

প্রমিতা ফিসফিসিয়ে বলল, ও আজই এসেছে। তোমাকে একটু পরে বলছি ওর কথা।

তবু শৈবালের বিস্ময় কমে না। ব্যাপার কী? বাড়িতে একটা অনাত্মীয় যুবতী মেয়ে রয়েছে এত রাত্রে, অথচ এর কথা প্রমিতা এতক্ষণে একবারও বলেনি।

এই উপলক্ষ্যে ঝগড়াটা থেমে গেল এবং শৈবাল নির্বিঘ্নে বাকি খাওয়াটা শেষ করল।

এরপর সাধারণত শৈবাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট শেষ করে। সারা দিন-রাতের মধ্যে এইটুকুই তার প্রকৃতি উপভোগের সময়।

কিন্তু অচেনা মেয়েটি রয়েছে বারান্দায়। সুতরাং শৈবাল সিগারেট ধরিয়ে শোয়ার ঘর আর খাওয়ার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। আড়চোখে দু-একবার মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে পারল না। সে পুরুষমানুষ, এটুকু কৌতূহল তার থাকবেই।

মেয়েটির মুখ ভালো করে দেখতে পায়নি শৈবাল। এখনও তার মুখ অন্ধকারের দিকে ফেরানো। সুন্দর ছাপা শাড়ি পরে আছে সে! কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়া? প্রমিতার কোনো বান্ধবীর বোন? পাড়ার অন্য কোনো বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে আসা কোনো মেয়ে? প্রমিতার নানারকম বাতিক আছে, সেরকম কোনো মেয়েকেও আশ্রয় দিতে পারে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

প্রমিতা টুকিটাকি কাজ সারছে রান্নাঘরে। খাওয়ার পর সাধারণত আধঘণ্টার মধ্যে শুতে যায় না শৈবাল। কিন্তু আজ একটা বই খুলে বিছানায় গিয়ে বসল।

মোট আড়াইখানা ঘরের ছোটো ফ্ল্যাট। রান্নাঘরের সামনে একটুখানি জায়গায় খাবার টেবিল পাতা। আর একটা বারান্দা। এক ঘরে ছেলে-মেয়েরা শোয়, আর এক ঘরে ওরা দুজন। বাকি আধখানা ঘরটি ওদের বসবার ঘর। খুবই সংক্ষিপ্ত ব্যাপার সেটি।

সল্টলেকে খানিকটা জমি কেনা আছে, কিন্তু সেখানে বাড়ি করার ব্যাপারে শৈবাল বা প্রমিতার কারোরই বিশেষ আগ্রহ নেই। শৈবালের মত বাড়ি বানানো মানেই ঝামেলা। আর প্রমিতা অত দূর যেতে চায় না। তার সব চেনাশুনো, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এদিকে থাকে।

অন্য দিনের চেয়ে খানিকটা দেরি করে এল প্রমিতা। শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করল। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার ক্রিমমাখা ও চুল আঁচড়ানোর পর্ব শুরু হবে। তাতে সময় লাগবে মিনিট কুড়ি। বাকি কথাবার্তা এই সময়েই সেরে নিতে হয়।

শৈবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তারপর।

প্রমিতা মুখ ঘুরিয়ে বলল, আস্তে, একটু আস্তে কথা বলো।

শয়নকক্ষে কেউ চিৎকার করে না। বিশেষত শান্তির সময়ে। অন্য দিন যে স্বরগ্রামে কথা বলে শৈবাল, আজও সেইভাবেই বলছিল, হঠাৎ তাতে আপত্তি দেখা দিল কেন?

প্রমিতা বলল, মেয়েটি এই বারান্দাতেই শুয়েছে!

এ ঘরের পাশেই বারান্দা। সেখান থেকে সব কথা শোনা যাবে। কিন্তু মেয়েটি বারান্দায় শোবে কেন? হঠাৎ কোনো অতিথি এলে তো বসবার ঘরটাতেই বিছানা করে দেওয়া হয়। এখন প্রায়ই শেষরাতের দিকে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে।

প্রমিতা বারান্দার দিকের জানলাটা বন্ধ করে দিল।

ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শৈবাল বলল, এই গরমের মধ্যে...

খানিকটা পরে আবার খুলে দেব!

অর্থাৎ তাদের কথাবার্তা শেষ হলে, আলো নেভাবার পর জানলা আবার খোলা হবে।

বারান্দায় শোবে? যদি বৃষ্টি আসে?

বলে দিয়েছি, বৃষ্টি এলে বিছানাটা টেনে নিয়ে যাবে রান্নাঘরের সামনে।

কেন, বসবার ঘরটায়?

প্রমিতা চোখের ভঙ্গিতে জানাল, তার দরকার নেই।

মেয়েটি কে?

ওকে আজ অরুণরা দিয়ে গেছে।

তার মানে?

অরুণরা বলে গেল ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে...

অরুণরা এক পাগলের জুটি। অরুণ আর তার বিদেশিনি স্ত্রী মার্থা। ওদের জীবন সাংঘাতিক বৈচিত্রপূর্ণ। প্রত্যেক দিনই ওদের জীবনে একটা-না-একটা কান্ড ঘটে।

ওর বাড়ি কোথায়? সেখানে আমরা কেন ওকে পাঠাব!

শোনো, তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি..সেই যে, সত্যানন্দ একটা বাচ্চামেয়েকে আমাদের বাড়িতে এনে দিল, তোমার মনে আছে? রেণু নাম ছিল, দু-তিন দিন কাজ করেছিল এখানে...

এসব শৈবালের মনে থাকার কথা নয়, জানারও কথা নয়। যাই হোক, সে কোনো মন্তব্য করল না।

সেই রেণু কিছুদিন আগে অরুণদের ওখান থেকে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল-জান তো ওদের ব্যাপার, সাত দিন বাদেই ফিরবে বলে যায়, কিন্তু কক্ষনো ফেরে না। একুশ

দিন বাদে সেই রেণু নিজে না ফিরে ওর দিদিকে পাঠিয়েছে...বলছে তো যে রেণুর অসুখ, সে আর কাজ করবে না, তার বদলে তার দিদি, ওর নাম হেনা।

শৈবাল আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঝি-চাকরের ব্যাপার? প্রমিতার এইসব ব্যাপারে দারুণ উৎসাহ। কতবার যে বাড়ির কাজের লোক আর রান্নার লোক বদলায়!

কিন্তু এই মেয়েটি ঝি? এত ঝলমলে শাড়িপরা, মোটামুটি দামিই তো মনে হল শাড়িটা। যুবতী মেয়ে, দামি শাড়ি অথচ ঝিয়ের কাজ করে–ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

শৈবালের চোখের ভাষা পড়ে নিয়েই বোধ হয় প্রমিতা বলল, এমন ঝুলিঝুলি নোংরা একটা শাড়ি পরে এসেছিল যে, দেখেই ঘেন্না করছিল আমার। সেইজন্য আমার একটা শাড়ি দিলাম ওকে।

তোমার শাড়ি? তাই বলো। সেইজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল।

তুমি আমার সব শাড়ি চেনো? ছাই চেনো! আচ্ছা, অরুণরা কী বলো তো, ওইরকম একটা ছেঁড়া নোংরা শাড়ি দেখেও সেই অবস্থায় আমাদের বাড়ি রেখে গেল? একটু চক্ষুলজ্জা নেই?

মার্থা তো শাড়ি পরে না, সে আর তোমার মতন হুট করে একটা শাড়ি দেবে কী করে? স্কার্ট বা ফ্রক দিতে পারত অবশ্য, কিন্তু স্কার্টপরা ঝি ঠিক আমাদের দেশে চলবে কি?

আহা হা, একটা শাড়ি কিনেও তো দিতে পারত! এদিকে তো গরিব-দুঃখীদের সম্পর্কে কত বড়ো বড়ো কথা বলে...একটা উঠতি বয়েসের মেয়ে...।

সেকথা থাক। কিন্তু অরুণা ওকে আমাদের বাড়িতে রেখে গেল কেন?

অরুণরা যে ইতিমধ্যে আর একটা লোক রেখে ফেলেছে। তা ছাড়া মার্থা বলেছে, বাড়িতে আর কোনো মেয়ে রাখবে না, ছেলে কাজের লোক রাখবে।

কেন, মেয়ে রাখবে না কেন?

রাখবে না। কোনো অসুবিধা আছে নিশ্চয়ই!

মার্থা কি তার স্বামীকে সন্দেহ করে নাকি?

এই, বাজে কথা বোলো না!

তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু সেজন্য মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে রেখে যাওয়ার কারণ কী?

ওই যে, রেণুকে আমরাই জোগাড় করে দিয়েছিলাম।

সেইজন্য তার দিদি আমাদের বাড়িতে ফেরত আসবে? আমাদের বাড়িতে কত-জন লোক লাগবে?

এ ফ্ল্যাটে একজন ঠিকে ঝি এসে বাসনপত্র মেজে দিয়ে যায়। আর একটি রান্নার লোক রাখতে হয়েছে। শৈবাল গোড়ার দিকে ক্ষীণ আপত্তি করেছিল এ ব্যাপারে। সে বলেছিল আমরা বরাবর মা-ঠাকুমার হাতের রান্না খেয়েছি। বাইরের লোকের রান্না তো দোকানে টোকানে গিয়েই খেতে হয়। আজকালকার মেয়েরা কি একদম রান্না ভুলে যাবে? তোমার তো হাতে অনেক সময় থাকে।

প্রমিতা ফোঁস করে উঠে বলেছিল, তুমি বুঝি রান্না করার জন্য আমায় বিয়ে করেছিলে। সারাদিন আমি উনুনের আঁচের সামনে থাকব আর তুমি বাইরে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে?

মেয়েদের ধারণা, পুরুষরা যে অফিসে চাকরি করে বা টাকা রোজগার করে, সেটা কোনো পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। যত খাটুনি শুধু বাড়ির মেয়েদের।

প্রমিতা আরও বলেছিল, আমি যদি রান্না করি, তা হলে ছেলে-মেয়ে দুটোকে পড়াবে কে? বেশ, তাহলে আমি রান্না করছি, তুমি ওদের পড়াবার জন্য মাস্টার রাখো!

এ যুক্তি অকাট্য। প্রমিতা বি এসসি পাস। তাকে রান্নার কাজে নিযুক্ত রেখে ছেলে মেয়েদের জন্য অন্য মাস্টার আনা মোটেই কাজের কথা নয়। তা ছাড়া মাস্টার রাখার খরচ বেশি। সুতরাং রান্নার জন্য ঠাকুর বরাদ্দ হল।

কিন্তু এই বারো বছরের বিবাহিতজীবনে অন্তত ন-বার রান্নার ঠাকুর বদল করেছে প্রমিতা। কখনো স্ত্রীলোক, কখনো পুরুষ। এরা প্রত্যেকেই যখন প্রথম এসেছে, তখন প্রমিতা এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যেকবার প্রমিতা বলেছে, এবার যে-লোকটি পেয়েছি, ঠিক এইরকম একজনকে চাইছিলাম।

শৈবাল মুচকি হেসেছে শুধু।

দু-তিন দিন পরই প্রমিতা সেই লোককে অপছন্দ করতে শুরু করে। একটা-না-একটা খুঁত বেরোয়।

শৈবাল প্রমিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, ঝি-চাকর তো আর দর্জির কাছে অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো যায় না। সুতরাং ঠিকঠাক মাপমতন হয় না। ওরই মধ্যে যতদূর সম্ভব মানিয়ে নিতে হয়। প্রথম দিন যাকে দেখে প্রমিতার খুব মায়া পড়ে যায়, মাসখানেক পরেই তাকে তাড়াবার জন্য সে একেবারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কত রকম দোষ বেরিয়ে পড়ে তাদের।

প্রত্যেক বার রান্নার লোককে বিদায় করে দিয়ে প্রমিতা মন খারাপ করে থাকে কয়েকদিন, তার মনটা এমনিতে নরম, হুট করে বাড়ি থেকে একজন লোককে তাড়িয়ে দিয়ে সে মোটেই খুশি হয় না। অথচ রাগের মাথায় তাদের ছাড়িয়েও দেয়।

এখন যে ছেলেটি রান্না করছে, সে প্রায় দেড় বছর টিকে আছে। এরও অনেক দোষ বার করেছে প্রমিতা, কিন্তু এর একটি প্রধান গুণ, শত বকুনি খেলেও কক্ষনো মুখে মুখে কথা বলার চেষ্টা করে না। অপরাধীর মতন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিছক বকুনি সহ্য করার ক্ষমতার জন্যই সে এখনও চাকরি হারায়নি। নইলে, রান্না অবশ্য সে মোটামুটি খারাপই করে। তার রান্না শৈবালের পছন্দ না হলেও সে ঘুণাক্ষরে কোনোদিন সেকথা জানায়নি।

অথচ প্রমিতা মোটেই ঝগড়াটি নয়, বকাবকি করা স্বভাবও নয় তার। বাইরের সবাই প্রমিতার স্বভাবের খুবই প্রশংসা করে। শুধু প্রমিতার আছে পরিষ্কার বাতিক। তার সঙ্গে ঝি চাকর কিংবা রান্নার লোকেরা পাল্লা দিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের তো এখন লোক দরকার নেই। অনন্তকে তুমি ছাড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

প্রমিতা বলল, সেকথা আমি বলেছি? আমাদের এখানে রাখবার কোনো প্রশ্ন উঠছে না। অরুণরা বলেছে, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে।

সে-ব্যবস্থা অরুণরা করতে পারেনি? আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে কেন?

তোমারই তো বন্ধু। তুমি জিজ্ঞেস কোরো!

তুমি রাখলে কেন?

বাড়িতে এনে ফেলেছে, তাড়িয়ে দেব?

কোথায় বাড়ি ওর?

বনগাঁর দিকে, কী যেন স্টেশনের নাম বলল।

ঠিক আছে, কাল অনন্তকে বোলো ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে

প্রমিতার রাত্রির প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে। পোশাকও বদলে নিয়েছে। এবার সে আলো নিভিয়ে শুতে আসবে। এক-একদিন প্রমিতা শুতে আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে শৈবাল। আজ প্রমিতার গল্প করার ঝোঁক এসেছে।

বিছানায় উঠে এসে প্রমিতা বলল, মেয়েটার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম...শুনলে বড় কষ্ট হয়...দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কী খাবে তার ঠিক নেই...একদম নাকি খাওয়া জোটে না...ওরা সাত ভাই-বোন, ওর বাবা নাকি বলেছে, নিজেরা যেমন করে পারে খাবার জোগাড় করে নিক! লোকটা মানুষ না পশু? বাবা হয়ে একথা ছেলে-মেয়েদের বলতে পারে?

শৈবাল একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার উদ্যোগ করেও থেমে গেল। শুরু করলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে।

প্রমিতা বলল, আমি ভাবছি।

ওকে আমাদের এখানেই রেখে দেবে?

না না, এত লোক রেখে আমরাই বা চালাব কী করে? আমার দিদি একজন কাজের লোকের কথা বলেছিল...জানি না পেয়েছে কিনা..কাল দিদির কাছে একবার খবর নেব, ওকে যদি রাখে।

শৈবাল গোপনে হাসল। ঝি-চাকরের ব্যাপারে প্রমিতা যেন একটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের যার যখনই কাজের লোকের দরকার হয়, অমনি তারা ফোন করে প্রমিতাকে। প্রমিতারও এব্যাপারে প্রবল উৎসাহ, অন্য কারুর অসুবিধে হলে তারই যেন বেশি দুশ্চিন্তা। শৈবাল এজন্যই বাড়িতে নিত্যনতুন ঝি-চাকর দেখতে পায়।

একবার প্রমিতা তার ছোটোমাসির বাড়িতে একটা চাকর পাঠিয়েছিল। সাত দিনের মধ্যেই সে-চাকরটা, সে-বাড়ি থেকে ঘড়ি, রেডিয়ো, প্রচুর জামাকাপড় আর কিছু টাকাপয়সা চুরি করে পালায়।

খবর শুনে প্রমিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল।

ছেলেটিকে প্রমিতা জোগাড় করেছিল মুড়িওয়ালার কাছ থেকে। সেই লোকটি তিন- চার বছর ধরে ওদের বাড়িতে নিয়মিত মুড়ি দিয়ে যায়। সেই লোকটিকে বেশ বিশ্বাসী ধরনেরই মনে হত। এর আগেও সে গ্রাম থেকে দু-তিনজন ছেলে-মেয়েকে এনে দিয়েছে ঝি-চাকরের কাজের জন্য।

এই ঘটনার পর সেই মুড়িওয়ালার আর পাত্তা নেই।

প্রমিতা এমনভাবে হা-হুতাশ করতে লাগল যেন তার নিজের বাড়ি থেকেই চুরি গেছে। সারাদিন শৈবালকে একটুও শান্তিতে থাকতে দিল না।

শৈবাল শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, চুরি হয়েছে তো কী আর করা যাবে? কলকাতা শহরে সব বাড়ি থেকেই একদিন-না-একদিন চুরি হয়। কলকাতায় থাকতে গেলে এ-রকম একটু সহ্য করতেই হবে।

তা বলে আমার জন্য ছোটোমাসির এত ক্ষতি হয়ে গেল?

তোমার জন্য?

তা নয় তো কী? আমি লোকটাকে দিলাম।

কেন দিতে গিয়েছিলে? তোমার কী দরকার, এইসব ঝামেলায় যাওয়ার? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে?

আমার ছোটোমাসির অসুবিধে হলে আমি কিছু ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব না? ছি ছি, এতগুলো টাকা!

শৈবাল রেগে উঠে বলেছিল, তাহলে কী বলতে চাও, ছোটোমাসিদের যত টাকা ক্ষতি হয়েছে, সব আমাকে দিতে হবে?

শেষপর্যন্ত ছোটোমাসি প্রমিতাকে এত অস্থির হতে দেখে নিজেই এসে বলেছিলেন, তুই এত ভাবছিস কেন? যা গেছে তা তো গেছেই। ছেলেটাকে দেখে তো আমারও ভালো মনে হয়েছিল প্রথমে।

তারপর শৈবাল প্রমিতাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল, সে আর ভবিষ্যতে অন্য কারুর বাড়ির ঝি-চাকর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সে-প্রতিজ্ঞা প্রমিতা একমাসও রাখতে পারেনি। আবার সব ঠিক আগের মতন চলেছে।

হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে?

না বোধ হয়। মাথায় সিঁদুর তো দেখলাম না।

এত বড়ো মেয়ে, বিয়ে হয়নি? ওদের তো কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়!

ওর বাবা খেতে দিতেই পারে না তো বিয়ে দেবে কী করে?

তোমার দিদির ছেলেটি বেশ বড় হয়েছে, ওবাড়িতে এ-রকম একটা যুবতী ঝি রাখা কি ঠিক হবে?

চুপ করো, অসভ্যের মতন কথা বোলো না।

যা সত্যি তাই বলছি। উঠতি বয়েসের ছেলেদের সামনে...

আঃ কী হচ্ছে কী? আস্তে কথা বলো না! পাশেই বারান্দায় রয়েছে মেয়েটা, সব শুনতে পাবে।

শৈবাল চুপ করে গেল। বারান্দাটা ঘরের একেবারে লাগোয়া। ওখান থেকে কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যেতে পারে ঠিকই। জানলাটা বন্ধ রাখলে অবশ্য হয়। কিন্তু এই গরমে জানলা বন্ধ রাখার কথা ভাবাও যায় না।

আজ আর প্রমিতাকে আদর-টাদর করাও যাবে না। নিজের বাড়িতে থেকেও সব কিছু নিজের ইচ্ছেমতন করা যায় না। এই কথা বুঝে নিয়ে শৈবাল ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে কীসের আওয়াজে যেন শৈবালের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল এক-একবার। বাইরে যেন খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে শৈবালের গায়ে।

সেই ঘুমের মধ্যেই তার মনে হল, মেয়েটি শুয়ে আছে বাইরের খোলা বারান্দায়, ঝড়ের মধ্যে সে কী করবে?

কিন্তু শৈবাল উঠল না। ওটা প্রমিতার ব্যাপার, সেই এখন ঠ্যালা সামলাক, তার কিছু করার নেই, এই ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

.

০২.

সকাল বেলা বাড়িতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দুই ছেলে-মেয়ের স্কুল, শৈবালের অফিস। মেয়ে যাবে সাড়ে আটটায়, ছেলে ন-টায় আর সাড়ে নটায় শৈবালের অফিস। এর মধ্যে এক মিনিট কারুর নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

সেই মেয়েটি কখনো বারান্দায়, কখনো রান্নাঘরের সামনে, কখনো বাথরুমের পাশে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকছে। প্রথম দিন সবাই এসে ওইরকম বোকা হয়ে যায়। ঠিক

বলে না দিলে বুঝতে পারে না কোন কাজটা তাকে করতে হবে। তা ছাড়া এবাড়িতে একজন কাজের লোক আছে আগে থেকেই। মেয়েটি নিজে থেকে কিছু করতে গেলে সে রেগে যেতে পারে। সে ভাববে, এই মেয়েটি বেশি কাজ দেখিয়ে তার চাকরিটা খাওয়ার চেষ্টা করছে।

রান্নাঘর থেকে শোয়ার ঘরে আসবার সময় প্রমিতা বলল, এই হেনা, ওরকম দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াসনি। মাথার তেল লেগে দেয়ালে দাগ ধরে যায়।

মেয়েটি অপরাধীর মতন সরে এল সঙ্গে সঙ্গে।

প্রমিতা বলল, তুই বরং বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক।

কাল রাত্তিরের ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই এখন আকাশে। এই সকালেই গনগন করছে রোদ। পাখার নীচে বসেও স্বস্তি নেই।

মেয়েটার স্কুলের গাড়ি এসে গেছে। ছেলেও বেরিয়ে গেল একটু পরে। এবার শৈবাল খেতে বসবে।

বাথরুমের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হতেই শৈবাল স্ত্রীর দিকে তাকাল। প্রমিতা অবাক হয়ে বলল, কে গেল বাথরুমে? অনন্ত, অনন্ত

শৈবাল বলল, অনন্ত নয়।

ও মা, ওই মেয়েটা বাথরুমে গেল নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজায় খট খট করে বলল, হেনা, এই হেনা, শিগগির খোল।

শৈবাল মুচকি মুচকি হাসছে।

বাথরুমের দরজা খুলল হেনা। প্রমিতা বলল, তুই বাথরুমে যাবি, সেকথা আমাকে বলবি তো। এই বাথরুমে নয়। নীচে আলাদা বাথরুম আছে। জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস না করেই হুট করে ঢুকে পড়লি এখানে?

অপরাধীর মতন মাথা নীচু করে রইল হেনা।

অনন্তকে ডেকে বকুনির সুরে প্রমিতা বলল, তুই ওকে নীচের বাথরুমটা দেখিয়ে দিসনি কেন? তোর এইটুকু আক্কেল নেই?

অনন্তর একটা বড়ো গুণ সে প্রতিবাদ করে না। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, এসো

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রমিতা আবার খাবার টেবিলে ফিরে এসে বলল, আমার বাথরুমে ঝি-চাকররা ঢুকলে আমার বড় গা ঘিনঘিন করে। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে দেখতে পেয়েছিলাম।

শৈবাল হাসিমুখে চুপ করে রইল।

সকাল নটা পর্যন্ত মেয়েটি প্রকৃতির ডাক অগ্রাহ্য করে চেপে থেকেছে কী করে, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার!

প্রমিতা একটু অনুতপ্ত গলায় বলল, অবশ্য ও বেচারা জানে না, ওর দোষ নেই। সকাল বেলা আমারই মনে করে বলে দেওয়া উচিত ছিল অনন্তকে! নানা ঝঞ্ঝাটে ভুলে গেছি।

শৈবাল জিজ্ঞেস করল, কাল রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল?

দারুণ ঝড়-বৃষ্টি। জলের ছাঁট এসে ঢুকেছিল ঘরে!

তখন ওই মেয়েটি কী করল?

আমি উঠে ওকে ভেতরে নিয়ে এলাম। অনন্তকে পাঠিয়ে দিলাম সিঁড়ির নীচে, হেনা খাবার ঘরেই শুল। তুমি তো কিছুই দেখোনি। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলে। সব আমাকেই করতে হয়।

আমি জেগে উঠেছিলাম, ইচ্ছে করেই কিছু বলিনি।

কেন?

বলে বিপদে পড়ি আর কী! যুবতী ঝি সম্পর্কে সমবেদনা দেখালেই বিপদ।

তোমার খালি বাজেকথা।

বাজে কথা? আমাদের অফিসের নীহারদার কী অবস্থা হয়েছিল জানো?

নীহার দাসের বাড়িতে এইরকম বয়েসের একটি মেয়ে কাজ করত। স্বাস্থ্য-টাস্থ্য ভালো। নীহারদা একদিন বউদিকে বললেন, মেয়েটাকে একটা শাড়ি কিনে দাও বড় ছেঁড়া একটা শাড়ি পরে থাকে, উঠতি বয়সের মেয়ে-বড্ড চোখে লাগে। ব্যাস, বউদি অমনি দপ করে জ্বলে উঠলেন।–উঠতি বয়েসের মেয়ে, ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকে, তুমি বুঝি সবসময় ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখ? বড্ড যে দরদ ওর জন্য! শাড়ি কিনে দাও! তুমি আমার একটা শাড়ি কেনার কথা তো কখনো মুখে আনো না।

প্রমিতাকে হাসতে দেখে শৈবাল বলল, হাসছ কী? ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছিল জানো? ওই একটা কথার জন্য নীহারদার প্রায় বিবাহবিচ্ছেদের উপক্রম! যাই হোক, শেষপর্যন্ত সেই মেয়েটিকে তো সেইদিনই ছাড়িয়ে দেওয়া হল বটেই, তা ছাড়াও বউদির মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য নীহারদা তাঁকে কাশ্মীর বেড়াতে নিয়ে গেলেন সেই মাসেই। পরে নীহারদা আমাদের কাছে আফশোস করে বলেছিলেন ভাই, একটা কথার জন্য সাত হাজার টাকা খরচ! নাক কান মুলেছি। আর কখনো বাড়িতে কমবয়েসি ঝি কিংবা রাঁধুনি রাখব না।

প্রমিতা বলল, যেমন তোমার নীহারদা, তেমন তোমার বউদি! আজকাল কেউ এত মাথা ঘামায় না এসব নিয়ে। যেসব মেয়েরা স্বামীকে সন্দেহ করে, তারা কখনো জীবনে সুখী হয় না।

খুব ভালো কথা। তা বলে ও মেয়েটিকে যেন আমাদের বাড়িতে রেখো না।

কেন, তোমার ভয়ে? তোমার ওপর এটুকু অন্তত আমার বিশ্বাস আছে।

শুনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু বাড়িতে ক-জন লোক রাখবে?

না, ওকে রাখব না। বললাম তো, ওকে দিদির বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। দিদির খুব অসুবিধে হচ্ছে।

শৈবাল বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রমিতার অখন্ড অবসর। মেয়ে স্কুল থেকে ফেরে সাড়ে তিনটের সময়। তার আগে পর্যন্ত আর প্রমিতার কিছু করবার নেই। এক-একদিন সে নিজেও বেরিয়ে পড়ে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শৈবাল চট করে প্রমিতার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, আজ তা হলে তোমার অ্যাডভেঞ্চার দিদির বাড়িতে?

প্রমিতা হাসল।

.

অফিস থেকে ফিরে শৈবাল দেখল, ঠিক আগের দিনের মতনই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি।

শৈবাল প্রমিতার দিকে প্রশ্নসূচক ভুরু তুলল।

হল না!

কেন?

প্রমিতা বলল, দিদি ঠিক কালই একজন লোক পেয়ে গেছে। একজনকে বলে, একটি ছেলেকে আনিয়েছে ক্যানিং থেকে। হুট করে তো আর তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না ।

তাহলে?

বাবারে বাবা! তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। আমি দেখছি একটা কিছু ব্যবস্থা করছি।

আমাকে চিন্তা করতে হবে না তো? বেশ ভালো কথা!

হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার-টাবার খেয়ে শৈবাল আবার অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বসেছে, এই সময় প্রমিতা বলল, এখনও অফিসের কাজ? বাড়িতে এসেও নিস্তার নেই? অফিস কি তোমাদের মাথাটাথা সব কিনে রেখেছে নাকি?

কাগজগুলো মুড়ে শৈবাল বলল, ঠিক আছে, সব সরিয়ে রাখলাম। সত্যিই এত কাজ করার কোনো মানে হয় না।

তোমার সঙ্গে আমার একটু আলোচনা আছে।

বলো—

মেয়েটাকে নিয়ে কী করি বলো তো? দিদির বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনার পর খুব কান্নাকাটি করছিল। দেশে গেলে খেতে পাবে না। ওর বাবা ওকে বাড়িতে জায়গা দেবে না, তাহলে ও যাবে কোথায়?

এই যে, তখন বললে, আমাকে এ নিয়ে কিছু চিন্তা করতে হবে না?

তা বলে তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শও করা যাবে না?

অর্থাৎ আমাদের বাড়িতেই রাখতে চাইছ?

একটা দুঃখী মেয়ে, তাকে তাড়িয়ে দেব?

দেশে এ-রকম লক্ষ লক্ষ গরিব-দুঃখী আছে। তাদের সবাইকে কি আমরা সাহায্য করতে পারব?

তুমি এ-রকম নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ কেন? লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা কী বলেছি? অন্তত যেটুকু আমাদের সাধ্য।

একটা ছেলে হলে বলতাম রেখে দাও। কিন্তু একটা মেয়ে, দেখতে খুব খারাপ নয়! এদের নিয়ে ঝামেলা আছে। শেষে তোমার সঙ্গে আমার না ঝগড়া বেধে যায়।

আ হা হা হা! ওকথা বার বার বলছ কেন, বলো তো? তোমাকে আমি খুব ভালোই চিনি। তোমার অনেক সুন্দরী সুন্দরী বান্ধবী আছে। তুমি মোটেই একটা ঝি-মেয়ের ওপর নজর দেবে না, আমি জানি।

বেশ, ভালো কথা। তাহলে তোমার যা ইচ্ছে করো!

যা ইচ্ছে করো মানে?

রাখতে চাও রাখো, না রাখতে চাও ট্রেনে চাপিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও!

আমি ওকে রাখার কথা ভাবছি না অবশ্য। শুধু যে ক-দিন অন্য কোথাও কাজ না পায়। আশ্চর্য ব্যাপার! এক-এক সময় কতজন যে কাজের লোক চেয়ে আমাকে বিরক্ত করে। অথচ এখন একজনও ওকে নিতে চাইছে না।

বোধ হয় মেয়েটা অপয়া।

যাঃ, বাজেকথা বোলো না। মেয়েটাকে দেখে আমার খুব মায়া হল।

শোনো প্রমিতা, তোমাকে কয়েকটা সত্যিকথা বলব? মেয়েটাকে দেখলে তোমার মায়া হয়, কিন্তু ও তোমার বাথরুমে ঢুকলে তোমার গা ঘিনঘিন করে। তোমাদের মায়া-দয়াগুলো একটুখানি গিয়েই দেয়ালে ধাক্কা খায়। যদি সত্যিই তোমায় মায়া হয় মেয়েটাকে দেখে, তাহলে ওকে ঝি-গিরি করতে পাঠানো কেন? তোমার গয়না বিক্রি করে কিংবা আমার অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ধার করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত-না? তাহলেই ও ভালোভাবে বাঁচতে পারবে।

তোমার যতসব অদ্ভুত কথা। আমরা ওর বিয়ে দিতে যাব কেন? কাজের জন্য এসেছে, কাজ জুটিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারি বড়োজোর।

তাহলে তাই করো। এতে তো আমার কাছে পরামর্শ চাইবার কিছু নেই।

প্রমিতা উঠে যেতেই আবার অফিসের কাগজপত্র খুলে বসল শৈবাল।

আরও দু-দিন মেয়েটা থেকে গেল এবাড়িতে। কাপড় কেচে দিয়ে, ঘরের ঝুল ঝেড়ে টুকিটাকি সাহায্য করতে লাগল প্রমিতাকে। মেয়েটি লাজুক, কথা খুব কম বলে।

তৃতীয় দিনে ঠিক দেববাণীর মতন এল প্রমিতার বান্ধবী ইরার টেলিফোন। সেদিন শৈবালের ছুটি, সে-ই ধরেছিল টেলিফোনটা। দু-একটা কথা বলেই ইরা জানাল–দেখুন-না, এমন মুশকিলে পড়ে গেছি, আমাদের রান্নার মেয়েটি হঠাৎ দেশে চলে গেল, আর ফেরার নাম নেই।

শৈবাল হাসতে হাসতে বলল, সেইজন্যই মনে পড়েছে তো আমাদের কথা? আমাকে রাখবেন? আমি কিন্তু মন্দ রান্না করি না।

ইয়ার্কি করছেন! আপনারা তো করবেনই, আপনাদের তো চিন্তা করতে হয় না, বাড়ির খাওয়া-দাওয়া কী করে চলবে!

বুঝতে পেরেছি, আমাকে আপনার পছন্দ নয়। কিন্তু আজ আমরাই আপনার মুশকিল আসান।

তার মানে?

আপনাকে আমরা আজই রেডিমেড রান্নার লোক দিতে পারি। ধরুন, আমি প্রমিতাকে ডাকছি!

প্রমিতা টেলিফোন ধরে বলল, হ্যাঁ, তোকে দিতে পারি একটা মেয়ে। কিন্তু এ বাড়ির কাজ টাজ করে, রান্নার কাজ ঠিক পারবে কি না জানি না।

ওপাশ থেকে ইরা বলল, ওতেই হবে। মেয়ে যখন কিছু-না-কিছু রান্না নিশ্চয়ই জানে। মেয়েটা তোদের বাড়িতেই আছে, ধরে রাখ, কোথাও যেতে দিস না, আমি এক্ষুনি আসছি।

প্রমিতা হাসতে হাসতে বলল, ধরে রাখতে হবে না। ক-দিন ধরে আমার বাড়িতেই আছে।

ইরা বলল, না বাবা, বিশ্বাস নেই। কতজনই তো লোক দেবে বলে কিন্তু শেষপর্যন্ত কী যেন গোলমাল হয়ে যায়। আমার ভীষণ দরকার, বাড়ি সামলাতে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। এদিকে আমার গাড়িটাও ক-দিন ধরে খারাপ। আমি এক্ষুনি তোর বাড়িতে আসছি ট্যাক্সি নিয়ে।

ইরার স্বামী অফিসের কাজে কুয়ালালামপুর গেছে ছ-মাসের জন্য। ইরা নিজেও একটা কলেজে পড়ায়। বাড়িতে একটা বাচ্চা। রান্নার লোক না থাকলে তার অসুবিধে হয় খুবই। ওদের বাড়িটাও খুব বড়ো। অত বড়ো বাড়ি রোজ ধোওয়া-মোছা করাও সহজ কথা নয়।

আধঘণ্টার মধ্যে এসে হাজির হল ইরা। তারপর শুরু হল ইন্টারভিউ।

মিনিট দশেক জেরার পর ইরা জিজ্ঞেস করল শেষ প্রশ্নটি : কত মাইনে নেবে?

হেনা মুখ নীচু করে চোখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, সে আপনি যা দেবেন।

ইরা প্রমিতাকে জিজ্ঞেস করল, হাউ মাচ শি এক্সপেক্টস?

প্রমিতা বলল, ঠিক আছে, হেনা তুই একটু রান্নাঘরে যা। আমি দিদিমণির সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।

হেনা চলে যেতেই প্রমিতা তার বান্ধবীর কানে কানে বলল, মেয়েটার সব ভালো, কিন্তু ভাত খায় বড্ড বেশি। এই অ্যা-ত্ত-খা-নি!

ইরা হেসে বলল, তা খাক-না যত খুশি ভাত। আমাদের চারখানা রেশন কার্ড। আমরা তো রেশনের চাল খাই না, সেসব ও একাই খেতে পারবে। তাতে আর কত খরচ! কত মাইনে দেওয়া যায় বল তো?

মেয়েটি দারুণ অভাবে পড়ে এসেছে। যা পাবে তাতেই খুশি হবে।

কুড়ি?

কুড়িটা বড্ড কম হয়ে যায়, আজকাল অত কম দিলে লোক টেকে না।

আমি আর একটু বেশি দিতে রাজি আছি। কিন্তু কাজ না দেখে, প্রথম থেকেই বাড়ালে

আর কম দিলে কী হবে জানিস, অন্য বাড়ি থেকে ভাঁড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঝি-চাকররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে ঠিক জেনে যায়, কোন বাড়িতে কে কত মাইনে দেয়?

তবে কত দেব, পঁচিশ?

আমরা অনন্তকে পঁয়তাল্লিশ দিই।

তোদের ছেলেটা তো হিরের টুকরো…চমকার রান্না করে, সেই যে সেবার খেয়ে গেলাম। ওকে পেলে আমি তো এক্ষুনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে রাজি আছি। তোরা মেয়েটাকে রাখ, আমি অনন্তকে নিয়ে যাই

আ-হা-হা! না রে ইরা, আমি বলছি, এও বেশ কাজ করতে পারবে, চটপটে আছে, কথা শোনে।

খুব একটা রোগাপাতলা নয়, খাটতে পারবে আশা করি।

শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে।

আমার যে ছাই শেখাবার সময় নেই। সামনের মাসে দিল্লিতে একটা সেমিনারে যাব, তার জন্য পেপার লেখা এখনও শেষ হয়নি...সেটা লিখব, না বাড়ির রান্নার কথা ভাবব।

শেষপর্যন্ত ইরা পঁয়তিরিশ টাকা দিতে রাজি হল।

চোখের সামনে একটা খবরের কাগজ মেলে পাশে বসে সব শুনছিল শৈবাল। তার মনে হচ্ছিল, ওই হেনা মেয়েটি যেন ক্রীতদাসী, ইরা যেন ওকে কিনতে এসেছে। দরদাম করছে প্রমিতার সঙ্গে। এ ব্যাপারে হেনার যেন কিছুই বক্তব্য নেই।

প্রমিতা হেনাকে ডেকে বলল, এই দিদিমণি তোকে পঁয়তিরিশ টাকা দিতে রাজি হচ্ছেন। দিদিমণি খুব ভালো, নিজের বাড়ির মতন থাকবি। কেমন?

হেনা ঘাড় হেলাল।

ইরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, আজ থেকেই শুরু করতে হবে। বাড়িতে রান্নাবান্না কিছু হয়নি। রান্নাগুলো প্রথম দু-একদিন আমি একটু দেখিয়ে দেব। শিখে নিতে পারবি তো?

হেনা আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ওরা চলে যাওয়ার পর শৈবাল বলল, যাক নিশ্চিন্ত!

প্রমিতা বলল, ইস তোমার যেন কতই-না দুশ্চিন্তা ছিল!

ছিল বই কী! দু-দিন ধরে আমাদের অনন্তকে কীরকম যেন গম্ভীর দেখছি! ও বোধ হয় বাড়িতে অন্য একজন কাজের লোকের উপস্থিতি পছন্দ করছে না।

মোটেই না, আমাদের অনন্ত খুব ভালো ছেলে! কাল মাছ একটু কম পড়েছিল, অনন্ত নিজে না খেয়ে, হেনাকে এক টুকরো মাছ দিয়েছে।

শৈবাল ভুরু তুলে সকৌতুকে বলল, তাই নাকি?

কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। দু-দিন বাদেই সকালে ফোন করল ইরা। সকাল বেলা, প্রমিতার দারুণ ব্যস্ততা, ফোন ধরারও সময় নেই।

ইরা বলল, তুই কী একটা গাঁইয়া মেয়েকে দিয়েছিস? গ্যাসটা পর্যন্ত নেভাতে জানে না।

প্রমিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, তুই তো ভালো করে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে দেখে-শুনে নিলি। আমি কি তোকে জোর করে দিয়েছি?

এরা যে, এত বোকা হয়, কে বুঝবে বল? আমি কত করে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে কলেজে চলে গেলাম। বিকেলে ফিরে এসে দেখি, গ্যাস জ্বলছে। বোঝো, সারাদিন গ্যাস জ্বলছে। এ রকম হলে তো দু-দিনেই সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

আমি তো বলেই দিলাম, মেয়েটা রান্নার কাজ ঠিক জানে না।

এত বড়ো একটা বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, বাড়িতে কি ও কখনো রাঁধেনি? জানে না যে, উনুন নেভাতে হয়?

খাবার টেবিল থেকে শৈবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি কতক্ষণ ফোনে এইসব গল্প চালাবে? আমাকে খেতে-টেতে দেবে না?

প্রমিতা সে-কথা শুনতেই পেল না। মানুষের দুটো কান থাকলেও অনেক সময়ই মানুষ একসঙ্গে দু-রকম শব্দ শুনতে পায় না। তা ছাড়া প্রমিতার মনটা একমুখী। একটা দিকে যখন সে মন দেয় তখন অন্যদিকে হঠাৎ আগুন লেগে গেলেও সে ফিরে তাকাবে না।

অনন্তর কাছ থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে শৈবাল যখন প্রায় শেষ করে এনেছে সেই সময় প্রমিতা ফিরে এল খাবার টেবিলে। শৈবাল খানিকটা রুক্ষ গলায় বলল, তাহলে মেয়েটা আবার আমাদের এখানে ফিরে আসবে?

কোন মেয়েটা?

ওই তোমার হেনা–যাকে তোমার বান্ধবীর বাড়িতে কাজ দিয়েছ?

না, না, ফিরে আসবে কেন? ইরার ভীষণ কাজের লোক দরকার।

তাহলে হেনার কাজের যাবতীয় সমালোচনা তোমাকে শুনতে হবে কেন? ও কাজে ভুল করলে সে-দায়িত্ব কি তোমার?

সে-কথা কে বলেছে?

তোমার বান্ধবী তো এতক্ষণ যাবতীয় অভিযোগ তোমাকেই শোনাচ্ছিল। যে রান্না করতে জানে না; তাকে দিয়ে জোর করে রান্না করাবে, আবার অভিযোগও করবে?

তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

আমার এসব একদম পছন্দ হয় না। গ্রামের মেয়ে, কোনোদিন গ্যাসের উনুন চোখে দেখেনি, এক দিনেই সব শিখে যেতে পারে? আমরা আমাদের অফিসের কাজ একদিনে শিখি?

ইরা ঠিক অভিযোগ করেনি, এমনি মজা করে বলছিল।

গরিবদের নিয়ে মজা করাটাও আমার ভালো লাগে না। আমি বলে রাখছি দেখো, ওই মেয়েটি আবার ফিরে আসবে এখানে।

তোমার বান্ধবী ইরার বাড়িতে কোনো লোক টেকে না।

ব্যাপারটা হল অবশ্য তার ঠিক বিপরীত। রাত্রি বেলা ফিরে শৈবাল দেখল অন্য দৃশ্য। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কোমরে আঁচল জড়িয়ে সেখানে মহাউৎসাহে রান্নায় মেতে আছে প্রমিতা, তার সারামুখে চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

শৈবাল উঁকি দিয়ে বলল, কী ব্যাপার?

প্রমিতা বলল, আজ তোমার জন্য চিলি চিকেন রান্না করেছি। দেখো, দোকানের চেয়েও ভালো হয় কি না?

বিয়ের পর প্রথম দু-এক বছর প্রমিতা মাঝে মাঝে নিজের হাতে কিছু কিছু রান্না করেছে। তার রান্নার হাতটা ভালোই। কিন্তু সেসব শখের রান্না। ঠিক গিন্নিবান্নিদের মতন সে নিয়মিত রান্না করতে ভালোবাসে না। সে ভালোবাসে রবীন্দ্রসংগীত, এখানে-সেখানে বেড়াতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে হইচই, বাংলা গল্পের বই এবং ঘুম। ঘুমের মতন প্রিয় আর কিছুই নেই প্রমিতার কাছে।

প্রমিতা বলল, আজ বিশেষ কিছু নেই- ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ আর চিলি চিকেন।

শৈবাল বলল, চমৎকার। আর কী চাই? একেবারে চীনে-বাংলা সংমিশ্রণ।

খেতে বসেও যখন দেখা গেল, প্রমিতাই পরিবেশন করছে, তখন শৈবাল জিজ্ঞেস করল, অনন্ত কোথায়?

প্রমিতা বলল, অনন্তর জ্বর হয়েছে। দুপুর থেকেই হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে।

ও, সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে তোমাকে রান্না করতে হয়েছে? তাই বলো।

মন্দ লাগল না। মাঝে মাঝে রাঁধতে ভালোই লাগে। মাঝে মাঝে অভ্যেসটাও রাখা ভালো।

ভাগ্যিস আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম। আজ দেরি করে ফিরলে নিশ্চয়ই একটা কেলেঙ্কারি হত।

আজ তুমি রাত বারোটা বাজিয়ে ফিরলে এইসব রান্নাবান্না ফেলে দিতুম আস্তাকুঁড়ে।

সেটা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতি হত! একে তো দেশে খাদ্যাভাব, তার ওপর এত ভালো রান্না...

তোমার পছন্দ হয়েছে?

দারুণ! হঠাৎ যদি এ-রকম সারপ্রাইজ দাও, তাহলে রোজই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব।

আহা হা-হা।

অনন্তকে কোনো ওষুধ দিয়েছ?

একদিনের জ্বর, কী আর দেব? বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে, সেদিন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাইরে শুয়েছিল তো।

শৈবাল বলল, সত্যি তোমার রান্না খুব ভালো হয়েছে। দোকানের চেয়ে অনেক ভালো। তোমাকে এজন্য একটা প্রাইজ দেওয়া দরকার।

রান্নার প্রশংসা শুনলে সব মেয়েই খুব খুশি হয়। প্রমিতা বেশ ভালো মেজাজে অনেকক্ষণ গল্প করল খাওয়ার পর। তারপর বিছানায় শুয়ে সে-রাতটা এদের বেশ ভালোই কাটল।

# ৩-৪. প্রমিতার মেয়ে বাবলি

প্রমিতার মেয়ে বাবলির জন্মদিন অগাস্টের সাত তারিখে, আর ইরার ছেলে পিকলুর জন্মদিনও ঠিক সেইদিন। সুতরাং দুই বান্ধবীই এই তারিখটা খুব খেয়াল রাখে।

এবছর আট তারিখ রবিবার। শনিবার ইদের ছুটি। চমৎকার ব্যাপার। আগে থেকে ঠিক করা ছিল এ-বছর ওই সময়, দুটি পরিবারই একসঙ্গে বেড়াতে যাবে ডায়মণ্ড হারবার, সেখানেই একসঙ্গে জন্মদিনের উৎসব হবে পিকলুর আর বাবলির।

ডায়মণ্ড হারবারে ইরার মামাদের বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে অনায়াসে যাওয়া যায়। শনিবার সকালে গিয়ে রবিবার সন্ধ্যের পর ফিরে আসা!

ইরার স্বামী ট্রেনিং-এর জন্য গেছে কুয়ালালামপুর। সুতরাং প্রমিতার স্বামী শৈবালকেই সব ব্যবস্থার ভার নিতে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবু শৈবালের মন খুঁতখুঁত করে।

বেড়াতে যে ভালোবাসে না শৈবাল তা নয়। ডায়মণ্ড হারবারে উইক-এণ্ড কাটিয়ে আসা তো বেশ ভালো প্রস্তাব। কিন্তু ইরার সঙ্গে কি পাল্লা দিয়ে পারা যাবে। ইরা মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে, টাকাপয়সার হিসেবেরই ধার ধারে না সে। অথচ, পুরুষসঙ্গী হিসেবে শৈবালেরই খরচ করা উচিত বেশি। কিন্তু শৈবালের হাতে টাকা জমে না। কী একটা কারণে যেন দু-তিন মাস ধরে বেশ টানাটানি চলছে।

পাঁচ তারিখে অফিসে বেরোবার মুখে শৈবাল বলল, কালই হয়তো আমায় একবার এলাহাবাদ যেতে হতে পারে।

প্রমিতা অবাক। এলাহাবাদ? সে কী! একদিনের মধ্যে গিয়ে ফিরে আসা যায় নাকি? কাল এলাহাবাদ যাবে মানে? কবে ফিরবে?

গেলে রবিবার রাত্তিরের আগে কী আর ফেরা যাবে?

তার মানে? আমাদের ডায়মণ্ড হারবার যাওয়া সব ঠিকঠাক।

কিন্তু অফিসের কাজ পড়লে কি না বলা যায়?

সাত, আট তারিখে তোমার ছুটি। তার মধ্যেও অফিসের কাজ?

আমাদের কি আর ছুটি বলে কিছু আছে?

কেন, তুমি এলাহাবাদে সোমবার যেতে পারো না?

একটা জরুরি টেণ্ডারের ব্যাপার আছে, জি এম বলছিলেন...

প্রমিতা রাগে মুখখানা গনগনে করে তাকাল স্বামীর দিকে। রাগ কিংবা আনন্দ কিংবা সবগুলিই প্রমিতার খুব তীব্র। সঙ্গে সঙ্গে মুখে তার ছাপ পড়ে।

আমাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলেই তোমার কাজ পড়ে যায়। আমি প্রত্যেকবার দেখেছি। তার মানে তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও না।

না, আমারও তো খুব ইচ্ছে, দেখি অফিসে আজ একবার বলে–

কোনো দরকার নেই। আমি ইরাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি, যাওয়া হবে না।

আরে আরে, হঠাৎ রেগে যাচ্ছ কেন? যাওয়া বন্ধ করবে কেন? যাওয়া হবেই, বাচ্চারা আশা করে আছে, আমি যদি না-ও যাই, তোমরা যেতে পারবে না?

এই বাচ্চাদের নিয়ে আমরা শুধু মেয়েরা যাব?

আজকাল স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে–পুরুষদের বাদ দিয়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না? তোমার বান্ধবী ইরা খুবই এফিসিয়েন্ট

প্রমিতা ঢুকে গেল রান্নাঘরে। একটু পরেই দুধ পোড়ার গন্ধে ভরে গেল সারা ফ্ল্যাট। অনন্তকে দোকানে পাঠানো হয়েছে, যাওয়ার সময় সে বলে গিয়েছিল, বউদি, গ্যাসটা বন্ধ করে দেবেন কিন্তু

এইরকম কোনো ব্যাপার হলেই প্রমিতা তার স্বামীকে দায়ী করে।

তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তো দুধটা পুড়ে গেল। অন্য দিন হলে রাগতভাবে এই কথাটা বলত প্রমিতা। আজ কিছুই বলল না, দাঁড়িয়ে রইল রান্নাঘরে। সুতরাং শৈবাল বুঝল, অবস্থা খুব গুরুতর।

অনেক গোপন কথা থাকে, যা নিজের স্ত্রীকেও বলা যায় না।

গতবছর কোলাঘাট বেড়াতে গিয়ে ডাব খাওয়া হয়েছিল। ছ-খানা ডাবের দাম ডাবওয়ালা চেয়েছিল ন-টাকা। যদিও সাইজ বেশ বড়ো ছিল, তবু দেড় টাকা করে একটা ডাব? এ তো দিনে ডাকাতি। গাড়ি-চড়া বাবু আর বিবিদের দেখে লোকটা যা-খুশি দাম হাঁকিয়েছে।

ইরাকে দাম দিতে দেয়নি শৈবাল, সে নিজেই টাকা বার করেছিল। অনেক দর কষাকষি করে রফা হল সাত টাকায়। শৈবাল দাম মিটিয়ে দেওয়ার পর ইরা বলেছিল, বাবাঃ, আপনি দরাদরিও করতে পারেন বটে! বেচারার মুখখানা কেমন করুণ হয়ে গেছে। তারপর নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা দু-টাকার নোট বার করে ডাবওয়ালার দিকে এগিয়ে দিয়ে ইরা বলেছিল, এই নাও তোমারই-বা আর মনে দুঃখ থাকে কেন?

সে-দিন খুব অপমানিত বোধ করেছিল শৈবাল। সামান্য দু-টাকার জন্য নয়, লোকটা তাকে ঠকাচ্ছে বুঝতে পেরেই সে সাত টাকা দিয়েছিল। তারপর ইরার ওইরকমভাবে টাকা দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?

সে-রাত্রে শৈবাল স্ত্রীকে বলেছিল, তোমার বান্ধবী ইরা বড় চালিয়াত। তখন ও ডাবওয়ালাকে হঠাৎ আবার টাকা দিতে গেল কেন?

প্রমিতা অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিল, ও মা, সেকথা তুমি মনের মধ্যে পুষে রেখেছ। একটা গরিব ডাবওয়ালাকে সামান্য দু-টাকা যদি বেশি দিয়েই থাকে, তাতে কী হয়েছে? মাঝে মাঝে তুমি এত কৃপণ হয়ে যাও

শৈবাল হল কৃপণ? কোলাঘাটে বেড়ানো উপলক্ষ্যে শৈবাল যে আড়াইশো টাকা খরচ করল, সেটা কিছু নয়? আর ডাবওয়ালাকে ন্যায্য দাম দিতে গেছে বলেই সে কৃপণ হয়ে গেল। শৈবাল নিজে ভালো করেই জানে সে কৃপণ নয়। কিন্তু বিনা কারণে পয়সা নষ্ট করতে তার গায়ে লাগে।

অফিস থেকে সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরতেই বাবলি বলল, বাবা, আমাদের ডায়মণ্ড হারবার যাওয়া হবে না? কেন যাওয়া হবে না? মা বলছিল

মেয়েটার মুখ দেখেই ধক করে উঠল শৈবালের বুকের মধ্যে। কত আশা করেছিল ওর জন্মদিন উপলক্ষ্যে পিকনিক হবে। ওর মনে আঘাত দিতে পারবে না শৈবাল।

ন-বছর বয়স বাবলির। মায়ের চেয়ে বাবাকে বেশি ভালোবাসে। ওর ছোটোভাই রিন্টু মায়ের বেশি প্রিয়। বাবলিকে কাছে টেনে নিয়ে শৈবাল বলল, হ্যাঁ যাওয়া হবে, আমি অফিসে ব্যবস্থা করে এসেছি

আসলে এলাহাবাদে যাওয়ার কথা ওর সহকর্মী চক্রবর্তীর। শৈবাল ভেবেছিল, চক্রবর্তীকে অনুরোধ করে তার বদলে ও নিজেই যাবে।

প্রমিতার মুখে এখনও রাগ রাগ ভাব। সে বলল, না, আমরা যাব না। দুপুরে ইরা এসেছিল, তাকে আমি বলে দিয়েছি, আমাদের যাওয়া হচ্ছে না, ইচ্ছে করলে ও একলা যেতে পারে।

হালকা গলায় শৈবাল বলল, ইরাকে ফোন করে দাও। বলো যে, আমাদের আবার যাওয়া ঠিক হয়েছে।

ইরাদের ফোন খারাপ।

তা হলে চিঠি লিখে অনন্তকে দিয়ে পাঠাও। কিংবা চলো আমরাই এখন বেড়াতে যাই ইরার কাছে। এক্ষুনি সব ঠিকঠাক করে আসি।

আস্তে আস্তে প্রমিতার মুখের রং বদলাতে লাগল। শৈবালের সবতাতেই হাসি-ঠাট্টা। কোনটা যে কখন সিরিয়াসভাবে বলে, তা বোঝাই যায় না।

যাওয়া হবে ইরার গাড়িতে। অনেক দিন বোম্বেতে ছিল, খুব ভালো গাড়ি চালায়। ওর গাড়িতেই দু-জন ধরে যাবে।

শৈবাল বলেছিল, ট্রেনে যাওয়াই তো ভালো। ডায়মণ্ড হারবারে ট্রেনে যেতে কোনো অসুবিধেই নেই। ঘণ্টা দেড়েকের জার্নি।

কিন্তু ইরা গাড়ি ছাড়া কোথাও এক পা যেতে পারে না। তা ছাড়া ডায়মণ্ড হারবার থেকে এদিক-ওদিক একটু বেড়াতে হলে গাড়ি লাগবে। ইচ্ছে হলে কাকদ্বীপ কিংবা নামখানা ঘুরে আসা যায়! গাড়ি যখন আছেই, তখন নিতে আপত্তি কী?

ঠিক আপত্তিটা যে কী, তা ঠিক খুলে বলা যায় না।

গাড়ি চালাবে ইরা, শৈবালকে তার পাশে বসতে হবে। আজকাল অনেক ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমান। মেয়েরাও আজকাল হাই কোর্টে জজ হয়, তা ঠিক। তবু একটা মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, আর একজন পুরুষ তার পাশে বসে আছে, এটা দৃষ্টিকটু লাগে।

এখানে আমাদের এই দেশে রাস্তার লোকে অবাকভাবে তাকিয়ে দেখে।

প্রমিতা নিজেই তো একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, ইরা সবসময় আমাদের নিয়ে যায়..তুমি গাড়ি চালানোটা শিখে নিতে পারো-না। তোমাদের অফিসে তো কত গাড়ি!

এ-রকম কথা শুনলে শৈবালকে শুধু বোকার মতন একটু হাসতে হয়, কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। গাড়ি চালানো শিখলে-বা কী হত? গাড়ির ব্যাপারে ইরা দারুণ খুঁতখুঁতে, স্টিয়ারিং-এ অন্য কারুকে হাত দিতে দেয় না। সেইজন্যেই তো ড্রাইভার রাখতে চায় না ইরা।

ইরা বলল, ওর বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে, সেই হেনাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কেন?

বাঃ ওখানে আমার মামাবাড়িতে শুধু তো একজন দারোয়ান আছে, আর কেউ নেই। রান্নাবান্না, মশলা বাটা, তরকারি, মাছ কোটা–এসব কে করবে?

প্রমিতা বলল, তাহলে তো আমাদের অনন্তকে নিয়ে গেলে হয়। ও তো ফ্ল্যাটে একলাই থাকবে। তার বদলে ও বরং আমাদের সঙ্গে চলুক!

কিছুদিন ধরে অনন্ত প্রায়ই জ্বরে পড়ছে। বাড়িতে যেসব টুকিটাকি ওষুধ থাকে, প্রমিতা তাই দেয়। একটু কমে ক-দিন পরে আবার জ্বর আসে!

সে জ্বর-গা নিয়েই কিন্তু অনন্ত কাজ করে, বাজারে যায়। বারণ করলেও শোনে না। ছেলেটা সত্যিই খুব ভালো।

প্রমিতা জিজ্ঞেস করল, কী রে অনন্ত, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার?

অনন্ত ঘাড় হেলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

শরীর ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ।

ইরা বলল, অনন্ত গেলে আরও ভালো হয়। ও তো খুব কাজের ছেলে।

এই প্রস্তাব শুনে শৈবাল খুব খুশি। গাড়িতে এত আটবে না। তাহলে মেয়েদের আর বাচ্চাদের ইরার গাড়িতে তুলে দিয়ে সে আর অনন্ত ট্রেনে চলে যাবে।

যাওয়ার আগের দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্রমিতাকে একথা জানাতেই সে ফোঁস করে উঠল।– তা কখনো হয়? আজকাল রাস্তাঘাটে কতরকম বিপদ-আপদ হতে পারে, কিংবা হঠাৎ যদি নিরালা কোনো জায়গায় গাড়িটা খারাপ হয়ে যায় তখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে...একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে না থাকলে কি চলে।

ইরা যতখানি স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী প্রমিতা ততটা নয় দেখা যাচ্ছে। সে এখনও পুরুষের পরিত্রাতা ভূমিকাটা পছন্দ করে। তা হলে হেনা আর অনন্ত এই দু-বাড়ির দুই ঝি-চাকরকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে ট্রেনে।

ইরা সদলবলে পৌঁছে গেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ভোর বেলাতেই গাড়ি চালিয়ে আরাম। বেশি বেলায় চিড়বিড়ে রোদ উঠে গেলে বাচ্চাদের কষ্ট হবে।

যথাসময়ে উঠতে পারবে কিনা এই ভয়ে প্রমিতা প্রায় সারা রাতই জেগেছিল, তবু সে তখনও তৈরি হতে পারেনি। জিনিসপত্র গুছোতেই তার আবার ভুল হয়ে যায়। শৈবাল তাড়া দিলেই সে বলে তুমি তো একটুও সাহায্য করতে পারো না।

দারুণ সুন্দর সেজে এসেছে ইরা। ছোট্টখাট্ট মেমসাহেবের মতো চেহারা তার, দেখে মনেই হয় না তার বারো বছরের একটা ছেলে আছে। ব্লুজিনসের প্যান্টের ওপর পরেছে একটা গোলাপি রঙের পাঞ্জাবি। মাথায় চুল বব করা। সেই তুলনায়, পিঠের ওপর চুল ফেলা, একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা প্রমিতাকে দেখাচ্ছে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির মতন। পোশাকে মিল নেই, তবু এই দু-জন দারুণ বান্ধবী।

ইরা বলল, হেনার ট্রেনে যাওয়ার দরকার নেই শুধু অনন্ত চলে যাক ট্রেনে। হেনার জায়গা হয়ে যাবে এর মধ্যেই।

জায়গা হয়ে যাবে ঠিকই, তবে বেশ চাপাচাপি হবে! দু-দিনের পিকনিকের জন্য মালপত্র তো কম নয়।

কিন্তু ইরার কথার প্রতিবাদে বলবে না, আসলে সে-ই দলনেত্রী। পিছনের সিটে প্রমিতা, বাবলি, হেনা আর রিন্টু, সামনের সিটে শৈবালের পাশে পিকলু।

গাড়িতে উঠলেই রিন্টুর ইচ্ছে হয় অন্য সব গাড়িকে ছাড়িয়ে যেতে। পাশাপাশি অন্য কোনো গাড়ি গেলেই সে লাফাতে থাকে, ইরা মাসি, আরও জোরে, ওই ফিয়াট গাড়িটাকে আগে যেতে দেবে না। আরও জোরে

জোরে চালাতে ইরার কোনো আপত্তি নেই। সে ভুলে যায় যে, এটা বোম্বাইয়ের মতন মসৃণ রাস্তা নয়। এটা কলকাতা, যেখানে-সেখানে গর্ত। শৈবালের ভয় করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মেয়েরা কেউ যখন আপত্তি করছে না, তখন একমাত্র পুরুষ হয়ে এ-রকম কথা বলা কী তার মানায়? অথচ শৈবাল জানে, সে ভীতু নয়। তার ভয় এই বাচ্চাগুলোর জন্য।

সে কথায় রিন্টুকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করে।

রিন্টু ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল, বাবা, তুমি গাড়ি চালাতে পারো না?

হাসিমুখে দু-দিকে মাথা নাড়ে শৈবাল।

বড়ো হয়ে আমি কিন্তু গাড়ি চালাব। ইরা মাসি তুমি শিখিয়ে দেবে না?

ইরা কৌতুকহাস্যে বলল, আমি তোর বাবাকেও শিখিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু তোর বাবার ইচ্ছেই নেই।

প্রমিতা বলল, হ্যাঁ, তুমি তো ইরার কাছ থেকেই গাড়ি চালানো শিখে নিতে পারো। ক দিনই বা লাগে?

এই আলোচনাটাই একদম পছন্দ হয় না শৈবালের।

গাড়ি খারাপ হল না বটে, কিন্তু আমতলা পেরিয়ে যাওয়ার পর চাকা পাংচার হল। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। এবার চাকা পালটাতে হবে। এটাও পুরুষদের কাজ। রাস্তাঘাটে কোনোদিন কোনো মেয়েকে চাকা পালটাতে দেখেনি শৈবাল।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইরা বলল, খাইসে!

ইরা বাঙাল নয়, তবু মাঝে মাঝে বাঙাল কথা বলা তার শখ।

জ্যাকটা টেনে বার করে ইরা গাড়ির নীচে বসাল।

প্রমিতা বলল, এখন তোকেই এসব করতে হবে নাকি?

ইরা বলল, উপায় কী? কাছাকাছি তো কিছু নেই।

শৈবাল যা আশঙ্কা করছিল, ঠিক তাই হল। প্রমিতা তার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলল, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ? হাত লাগাতে পারছ না?

শৈবালের বলবার ইচ্ছে হল যে, আমি যখন গাড়ি চালাতেই শিখিনি, তখন শুধু চাকা পালটানো শিখতে যাব কেন? আমি কি মেকানিক?

কিন্তু এসব সরল যুক্তির কথা মেয়েদের কাছে বলে কোনো লাভ নেই, তার বদলে শৈবাল উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিল খুব সহজে।

উলটো দিক থেকে একটা খালি লরি আসছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে সেটাকে থামিয়ে ফেলল শৈবাল। তারপর ড্রাইভারকে মিনতি করে বলল, ভাই পাঁচটা টাকা দেব, আমাদের চাকাটা একটু পালটে দেবেন?

আট-দশ মিনিট সময় খরচ করে পাঁচ টাকা রোজগার করতে কে না রাজি হয়। ড্রাইভারটি উৎসাহের সঙ্গে নেমে এল।

ইরাই যে গাড়ির চালক, তা বুঝতে পেরে একটু কৌতুকও বোধ করল ড্রাইভারটি। সে বাঁকাভাবে দু-একবার তাকাল শৈবালের দিকে।

চাকা পালটাবার কাজ চলছে, এরইমধ্যে হাজির দু-টি ছেলে, তাদের কাছে ডাব। ছুটির দিনে এপথ দিয়ে অনেক টুরিস্ট যায়, সেইজন্য ডাব নিয়ে ছেলের দল সব জায়গায় তৈরি।

ইরা বলল, ভালোই হল, ডাব খাওয়া যাক।

শৈবাল প্রমিতার চোখের দিকে তাকাল। কোনো ভাষা ফুটল না সেখানে। অর্থাৎ প্রমিতার মনে নেই।

আবার সেই দরাদরির ঝামেলা। মানিব্যাগটা বার করে প্রমিতাকে দিয়ে শৈবাল বলল, তোমরা ডাব খাও–দামটা দিয়ে দিয়ো, আমি একটু আসছি।

খানিকটা এগিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এমন একটা কাজ সারতে গেল শৈবাল, যে-সময় সে-দিকে মেয়েদের তাকাতে নেই।

ডায়মণ্ড হারবার পৌঁছোতে বেজে গেল দশটা। অনন্ত অনেক আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে, সাগরিকার সামনে।

ইরার মামাবাড়ির শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে। খোলামেলা চমৎকার বাড়ি। একতলা-দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। এমন বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে।

দুপুরে এবাড়িতেই রান্না হবে, না সাগরিকা থেকে খাবার আনানো হবে, তাই নিয়ে সামান্য মতভেদ হল।

এখন বাজার করে রান্না বসাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে ঠিকই তবু শৈবালের মত এই যে, পিকনিক করতে এসে আর দোকানের খাবার খাওয়া কেন? আসবার পথে ছেলে-মেয়েরা তো হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছেই।

ইরা বলল, এবেলা রান্নাবান্নার আর ঝামেলা করে লাভ নেই। ওবেলা হবে।

প্রমিতা বলল, শুধু খিচুড়ি আর মাছভাজা হলে বেশিক্ষণ দেরি লাগবে না। মশলাপাতি আমি সঙ্গে এনেছি।

শৈবাল ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা খিচুড়ি খেতে চাও, না দোকানের খাবার খেতে চাও? হাত তোলো।

ছেলে-মেয়েরা সবাই একসঙ্গে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, খিচুড়ি খিচুড়ি!

ইরা বলল, তবে তাই হোক।

হেনাকে পাঠানো হল উনুন ধরাতে। অনন্ত বাজারে যাবে। প্রমিতা তাকে জিনিসপত্রের লিস্ট করে দিতে লাগল।

একটু বাদেই ইরা ঘুরে এসে বলল, এই প্রমিতা শোন, এরমধ্যেই প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল, অনন্ত এখন বাজারে যাবে, ফিরে আসবে, তারপর রান্না চাপবে, সে কত বেলা হবে ভেবে দেখ।

শৈবাল বলল, ছুটির দিন, দেড়টা-দুটোর মধ্যে রান্না হলেই তো যথেষ্ট।

ইরা বলল, আপনি বুঝতে পারছেন... তার চেয়েও বেশি দেরি হলে..ছোটোদের হজম হয় না, তা ছাড়া অনেক গরম জল করতে হবে, আমি তো বাইরে কোথাও গরম জল ছাড়া স্নান করি না, পিকলুকেও গরম জলে..

প্রমিতা বলল, আমি স্নান সেরে এসেছি।

ইরা বলল, আজ এবেলা রান্না থাক। অনন্ত, তুমি বরং সাগরিকায় গিয়ে অর্ডার দিয়ে এসো, আমাদের যে ক-প্লেট লাগবে বলে দিচ্ছি...আমরা ঠিক একটা পনেরোর মধ্যে খেতে যাব...বাচ্চাদের জন্য পাতলা স্টু, আর...

অর্থাৎ ইরার কথাই শেষপর্যন্ত থাকবে। অন্যদের মতামতের কোনো দাম নেই, ইরা যা বলবে তাই করতে হবে।

শৈবালের চোয়ালটা কঠিন হয়ে গেল এবার।

পরক্ষণেই সে ভাবল, থাক, রান্না করে আর কী হবে। স্ত্রীর বান্ধবী, তার ওপরে সুন্দরী তার সঙ্গে তো শৈবালের মধুর সম্পর্কই থাকা উচিত। শুধু শুধু মন কষাকষির কোনো মানে হয় না, তাও বাইরে বেড়াতে এসে।

ইরার সব কিছু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। ঠিক একটা বেজে দশ মিনিট পর সে গাড়ির হর্ন দিতে লাগল। এবার খেতে যেতে হবে। বাচ্চারা বাগানে হুটোপাটি করে খেলছিল, তারা সবাই বলল, তাদের এখনও খিদে পায়নি।

শৈবালের খিদে পায়নি। আকাশে মেঘ করে আছে, কিন্তু বেলাই হয়নি মনে হয় কিন্তু সাগরিকায় সময় বলে দেওয়া হয়েছে, ইরা আর কাউকে দেরি করতে দেবে না। সবাইকে উঠে পড়তে হল গাড়িতে।

বড়ো বড়ো হোটেলে ঝি-চাকরদের মেঝেতে বসে খেতে দেয় না। আবার বাবুদের মতন একইরকম টেবিলে খেতে দিলেও কেমন দেখায়। কিন্তু হেনা আর অনন্তকে তো খেতে হবে।

শৈবাল জোর দিয়ে বলল, তোমরাও এখানেই বোসো। তারপর একজন বেয়ারার চোখের দিকে তাকিয়ে হুকুমের সুরে সে বলল, ওরা যা খেতে চাইবে দেবে।

একেবারে পাশাপাশি টেবিল নয়, অনন্ত বেছে নিল একেবারে দূরে এক কোণের একটা টেবিল।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খেতে বসলে তাদের ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে ওঠে। বড়োদের নিজস্ব কথা বলার কিছু থাকে না। ইরা ও প্রমিতা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত রইল, শৈবাল রইল নিঃশব্দ। একবার দূরে অনন্তদের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছে ওরাই। দু-জনের বয়েস কাছাকাছি, মনে হতে পারে ওরা দু-জন প্রেমিক প্রেমিকা লুকিয়ে লুকিয়ে সাগরিকায় খাচ্ছে। হোক-না ওদের পোশাক অতিমামুলি!

ওরা অবশ্য কথা বলছে না বিশেষ, পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। অনন্ত এমনিতেই কম কথা বলে।

ইরা ব্যাগ বের করছে দেখে, শৈবাল বলল, আমি দিচ্ছি।

ইরা বলল, না না, আজ আমি আপনাদের এনেছি।

যাঃ! রাখুন তো!

এ কী, সাগরিকায় আমিই জোর করে আপনাদের নিয়ে এলুম।

শৈবাল আর বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, বেয়ারার ট্রের ওপর টপ করে ফেলে দিল একটা এক-শো টাকার নোট।

বেয়ারাটি শৈবালের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, এক-শো বারো টাকা স্যার!

শৈবালের একেবারে আঁতকে ওঠার অবস্থা। এক-শো বারো টাকা! ডাকাত নাকি? এই তো খাবারের ছিরি? অনন্ত, হেনা বেশি খেয়েছে। না, অনন্ত খুব কম খায়। হেনা তো

অর্ডার দেয়নি। ও টেবিলে অনন্তই অর্ডার দিয়েছে, সে কখনো বাবুদের বাজে খরচ করাবে না। ছেলে-মেয়েরা দু-একটা ডিম বেশি নিয়ে নষ্ট করেছে অবশ্য।

বাড়িতে খিচুড়ি আর মাছভাজা খেলে কত খরচ হত? পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশি কিছুতেই নয়। আর গরম গরম খিচুড়ির সঙ্গে টাটকা ইলিশ মাছভাজা এই দোকানের খাবারের চেয়ে অনেক বেশি উপাদেয় হত না?

শুধু শুধু এতগুলো টাকা নষ্ট। অথচ একথা বলতে গেলেই শৈবাল ওদের চোখে কৃপণ হয়ে যাবে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৈবাল ভাবল, ছেলে-মেয়েরাই সবচেয়ে সুখী। ওদের সবসময় মনে মনে টাকার হিসেব করতে হয় না।

দুপুর বেলা খাটে শুয়ে একটা বই পড়ছিল শৈবাল। ঘরের তো অভাব নেই। তাই শৈবাল একটা আলাদা ঘর নিয়েছে। সব ঘরেই খাট আর গদি পাতা। ইরার স্বামী আসেনি। সেইজন্য রাতে শৈবাল আর প্রমিতার এক ঘরে শোয়া ভালো দেখায় না। তার চেয়ে দুই রমণী দু-ঘরে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকুক, শৈবাল আলাদা, সে যেন বাইরের লোক।

বাবলি এসে বলল, বাবা, জানো তো হেনাদিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শৈবাল উঠে বসল।–কী?

হেনাদি নেই। কোথায় যেন চলে গেছে।

লম্বা টানা বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ইরা আর প্রমিতা।

শৈবাল প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, অনন্ত কোথায়?

প্রমিতা বলল, ওই তো অনন্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত ওইখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, পেছনের বাগান-টাগান দেখে এসেছি আমি। কোথাও নেই।

ইরা কোনো কারণে দু-তিনবার ডেকেছিল হেনাকে। সাড়া পায়নি। তারপরই হেনার খোঁজ পড়েছে। সে নেই, সে কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

প্রমিতার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল! গ্রাম্য বোকা মেয়ে, হঠাৎ কারুকে কিছু না বলে চলে গেল? নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে।

অনন্ত বলল, রাস্তায় দেখে আসব?

প্রমিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটু দেখবে? এদিককার রাস্তা দিয়ে খুব জোরে গাড়ি যায়–

এই দুপুর বেলা যুবতী ঝিকে খোঁজার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার একটুও ইচ্ছে নেই শৈবালের। তাও নিজের বাড়ির নয়, অন্য বাড়ির ঝি।

ওই অনন্ত দেখে আসুক।

পিকলু বলল, আমিও যাই অনন্তদার সঙ্গে?

বাবলি রিন্টুও অমনি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আসে। দুপুর বেলা ওদের আটকে রাখা হয়েছিল।

শেষপর্যন্ত শুধু অনন্তই গেল।

আর ঘুম কিংবা বই পড়া হল না। একতলায় নেমে এল তিনজনে! অনন্ত হেনাকে খুঁজে না পেলে থানায় খবর দিতে হবে কি না, সে-কথা দুই নারীই জিজ্ঞেস করে শৈবালকে। অর্থাৎ সেরকম কিছু হলে শৈবালকেই যেতে হবে থানায়। পুলিশ-টুলিশ সে একেবারেই পছন্দ করে না।

ইরা বলল, এইজন্যই কম বয়েসি কাজের মেয়ে রাখা এক ঝামেলা।

প্রমিতা বলল, মেয়েটা খুব ভালো।

তা ঠিকই। কিন্তু চোখে চোখে রাখতে হয়। তোদের ছেলেটা খুব কাজের, সব বুঝে-শুনে করে।

অনন্তর তো সবই ভালো, তবে রান্নাটা তেমন পারে না।

আমার সঙ্গে বদলাবদলি করবি? তুই হেনাকে নে? আমার ভালো রান্নার দরকার নেই।

এর উত্তরে প্রমিতা শুধু হাসল। এত বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য ছেলে অনন্ত। তাকে সে নিজের বাড়িতে কাজ ছাড়িয়ে দেবে কোন যুক্তিতে? এখন ঘরের ছেলের মতন হয়ে গেছে।

একটু পরেই হেনাকে ধরে নিয়ে এল অনন্ত। হেনার কাপড়চোপড় সব ভেজা।

চোখ কপালে তুলে প্রমিতা বলল, কী সর্বনাশ! জলে পড়ে গিয়েছিল নাকি?

অনন্ত মুচকি হেসে বলল, না।

তাহলে এ-রকম ভেজা কেন?

অনন্ত হাসিমুখটি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমি জানি না। আমি তো গিয়ে দেখলাম ওইরকম...

এবার প্রমিতা মেয়েটির দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

হেনা খুবই ভয় পেয়ে গেছে। মুখ নীচু করে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

কোথায় গিয়েছিলি? কথা বলছিস না কেন?

হেনা তবু অপরাধীর মতন মুখ আমশি করে দাঁড়িয়ে আছে।

চুপ করে রইলি কেন? বল কোথায় গিয়েছিলি? এই অচেনা জায়গায়।

চান করতে গিয়েছিলাম।

চান করতে! এই বেলা সাড়ে তিনটের সময়? একতলায় তোকে তো বাথরুম দেখিয়ে দিয়েছি, তবে আবার কোথায় গিয়েছিলি?

হোটেলের একজন লোক বলল, এখানে...এই নদী গঙ্গা...গঙ্গার কাছে এসে চান না করলে পাপ হয়। সেইজন্য ভাবলুম একটা ডুব দিয়ে আসি।

প্রমিতাই হেনাকে দিয়েছে ইরার বাড়িতে। সেইজন্য তারই যেন দায়িত্ব এইভাবে সে জেরা করেছিল। কিন্তু ইরা ওর মাইনে দেয়, সুতরাং সেই ওর মালিক। সুতরাং সে এগিয়ে এল এবার!

শৈবাল একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এরমধ্যে তার মাথা গলাবার দরকার নেই।

ইরা জিজ্ঞেস করল, তুই গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলি, আমাদের কারুকে বলে যাসনি কেন?

সেইরকম নতমুখে থেকে হেনা বলল, ভাবলুম আপনারা ঘুমোচ্ছেন

তা বলে অচেনা জায়গা–হঠাৎ না বলে-কয়ে-তুই অনন্তকে বলে যাসনি কেন? ও তো জেগেই ছিল।

হেনা এবার চুপ।

শৈবাল ভাবল, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। হেনা আর অনন্ত পরস্পর খুবই কম কথা বলে! খাবার টেবিলেও ওরা গল্প করেছে বলে মনে হয়নি। আমরা ভাবি এক বয়েসি ছেলে মেয়ে কাছাকাছি এলেই ভাব করে নেবে, প্রেম-ট্রেমের চেষ্টা করবে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা কি তা করে না?

ইরা বলল, যা শিগগির কাপড় বদলে নে। তুই দোতলাতেই থাকবি, তোর ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

অনন্ত থাকবে একতলায়। আর দোতলায় ভাঁড়ার ঘরের মতন একটা ছোট্ট খালি ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে হেনার জন্যে। এটা ইরা আর প্রমিতা আগেই ঠিক করে নিয়েছে।

সন্ধ্যে বেলা একসঙ্গে জন্মদিন হল বাবলি আর পিকলুর। দু-টি কেক আনা হয়েছে, আর সমান মোমবাতি। অন্য অন্য বছর এইদিনে বাবলি আর পিকলুর ক্লাসের বন্ধুরা আসে। এবার তারা কেউ নেই, তবু খুব জমে গেল।

ইরা আর প্রমিতা গান গাইল, হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ...ও ডার্লিং।

শৈবাল গাইল : পিকলু-বাবলির জন্মদিনে জানাই ভালোবাসা...সুখে থাকো, ভালো থাকো, এই আমাদের আশা।...

তারপরই শৈবাল চলে গেল মাছের আড়তে। ডায়মণ্ড হারবারে এলে টাটকা ইলিশ না খেলে কোনো মানেই হয় না।

প্রায় সওয়া দু-কিলো ওজনের একটা সুগঠিত ইলিশ নিয়ে শৈবাল ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। মুখে বেশ গর্বের ভাব।

বাইশ টাকা করে কিলো। তা হোক, এক-আধদিন একটু বাজে খরচ করা যায়ই।

ইরা ইলিশ মাছ খায় না। ওর অ্যালার্জি হয়। আফশোস করে ইরা বলল, জানেন ছেলেবেলায় কী ভালোবাসতুম ইলিশ খেতে! এখনও দেখলে লোভ হয়। কিন্তু খাবার উপায় নেই-কী যে, ছাই অ্যালার্জি, একটু মুখে দিলেই সারাগায়ে র‍্যাশ বেরোবে।

শৈবাল নিরাশ হয়ে গেল। ইলিশ মাছেও কারুর যে অ্যালার্জি থাকতে পারে সে কোনো দিন ধারণাই করেনি।

প্রমিতা বলল, তুমি ফট করে আমাদের না জিজ্ঞেস করে-টরে হঠাৎ একটা এত বড়ো ইলিশ আনতে গেলে কেন? ভেবেছিলুম আজ মুরগি হবে।

শৈবাল ভেবেছিল, ওদের না জানিয়ে হঠাৎ এত বড়ো একটা ভালো ইলিশ এনে চমকে খুশি করে দেবে। তার বদলে এইরকম প্রতিক্রিয়া?

সে ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে সমর্থন পাওয়ার জন্য তাকাল। ইংরেজি স্কুলে পড়া আজকালকার বাচ্চা, ওদের মাছ সম্পর্কে কোনো আগ্রহই নেই! মাছ খেতেই চায় না। ইংলিশ মিডিয়াম কি মাছকে অবজ্ঞা করতে শেখায়? সব বাচ্চার একই অবস্থা কেন?

শৈবালের বাবা এক-একদিন হঠাৎ বাগবাজারের ঘাট থেকে এ-রকম ইলিশ কিনে আনতেন সন্ধ্যে বেলা। ছোটো ভাই-বোনদের সঙ্গে শৈবাল আনন্দে হইহই করে উঠত তা দেখে। ইলিশের গন্ধে ম-ম করত সারাবাড়ি। ভাত খাওয়ার পর আঁচাতে ইচ্ছে করত না, যদি হাত থেকে ইলিশের গন্ধটা চলে যায়। হ্যাঁ, শৈবালদের দেশ পূর্ববঙ্গেই।

তাহলে মুরগিই থোক?

ইরা বলল, না না, অত বড়ো মাছটা এনেছেন, আবার মুরগির কী দরকার! আমি না-হয় খাব না। রাত্রে আমার মাছ-মাংস না খেলেও চলে।

প্রমিতা বলল, অত বড়ো মাছ কে খাবে? নষ্ট হবে। আমি এক টুকরোর বেশি খেতে পারি না। ছেলে-মেয়েরাও এক-আধ টুকরো খায় কিনা সন্দেহ।

হেনা আর অনন্ত মুগ্ধভাবে চেয়ে আছে মাছটার দিকে। ওরা গ্রামের লোক, ওরা মাছ চেনে। শৈবাল ওদের সঙ্গে বসে খাবে।

ইরা বা প্রমিতা কারুরই রান্নাঘরে ঢোকার ইচ্ছে নেই। বেড়াতে এসে কারই-বা এসব ভালো লাগে! আর কাজের লোক আনা হয়েছে যখন, তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। অনন্ত আর হেনা গেল রান্নাঘরে।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে হেঁটে আসা হল। তারপর বাড়িতে ছাদের ওপরে আড্ডা। এখান থেকেও নদী দেখা যায়। হু-হু করে বইছে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন হাওয়া। ইরা অনেকরকম মজার মজার খেলা জানে, ছেলে-মেয়েদের একেবারে জমিয়ে রেখে দিল। কখন যে সময়টা কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ একসময় দেখা গেল দশটা বাজে। রিন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে একফাঁকে। ডেকে তোলা হল তাকে।

নীচে নেমে এসে প্রমিতা বলল, অন্তত, বাচ্চাদের আগে খাবার দিয়ে দে।

অনন্ত কাঁচুমাচু মুখে জানাল, এখনও ভাত হয়নি। সবে চাপানো হয়েছে। শোনামাত্র দুই মা তাদের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। এখনও ভাত হয়নি! ছেলে-মেয়েরা খাবে কখন? রাত দশটা বেজে গেল...। কেন ভাত হয়নি?

মাছ কোটা হয়েছে, দু-রকম মাছের ঝোল হয়েছে, ডাল হয়েছে, এঁচোড়ের তরকারি, ফুলকপির ডালনা..ভাতটা শেষকালে করবে ভেবেছিল অনন্ত।

প্রমিতা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধরল! অনন্তকে আজকাল সে বকুনি দেয় না, তবু আজ বকল, তোর একটু আক্কেল নেই? ছেলে-মেয়েরা খাবে...

ইরা বলল, ভাতটা হয়ে থাকলে তবু শুধু দু-টি ডাল-ভাত একটা কিছু ভাজা-টাজা দিয়ে খাইয়ে দিতাম। সন্ধ্যে বেলা তো অনেকখানি কেক খেয়েছেই

প্রমিতা বলল, কী করছিলি এতক্ষণ, আড্ডা মারছিলি?

ইরা বলল, এঁচোড়ের তরকারি, আবার ফুলকপির ডালনা–এত রকম হাবিজাবি কে করতে বলেছে?

অনন্ত বলল, আপনি, ইলিশ মাছ খাবেন না, তাই ভাবলুম ফুলকপির ডালনাটা–

ইরা বলল, আমার জন্য? রাত বারোটার সময় আমি ওইসব খেতে যাব আর ছেলে মেয়েরা না খেয়ে ঘুমোবে?

প্রমিতা বলল, দুটো উনুন, দু-হাতে কাজ করলে এতক্ষণে সব কিছু হয়ে যাওয়ার কথা কী করছিলি সত্যি করে বল তো?

শুধু অনন্তই বকুনি খাচ্ছে দেখে ইরা এবার তার দাসীকে ডেকে বলল, হেনা তুই জানিস, পিকলুবাবু সাড়ে নটার মধ্যে খায়? আর সওয়া দশটা বেজে গেছে, এখনও ভাতই হয়নি

হেনা বলল, আমি তো ভেবেছিলাম...

-চুপ! তোকে কে ভাবতে বলেছে? তোর কাজ করার কথা, ভাবার তো কথা নয়!

এরপর হেনা আর অনন্ত প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো বকুনি খেল কিছুক্ষণ। ওরা অবশ্য কেউই আর উত্তর দিল না।

ছেলে-মেয়েরা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের স্বভাবই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া। ওরা ভোরে ওঠে। কেননা স্কুলে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। শৈবালদের সময় স্কুল ছিল এগারোটায়, এখন তার ছেলে-মেয়েরা সাড়ে আটটার মধ্যে স্কুলে চলে যায়।

যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই খেতে বসিয়ে দেওয়া হল ওদের। ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো যে কঠিন কাজ! এক-একজন ঢুলে ঢুলে পড়ে, আর প্রমিতা আর ইরা তাদের

ডেকে ডেকে জাগায়। ইলিশ মাছ ওরা প্রায় কেউই খেল না। কেক খেয়ে ওদের পেট ভরতি, ওদের খাবার ইচ্ছে নেই।

বড়োরা খেতে বসল একটু পরে। তখন শৈবাল বুঝতে পারল, কেন অনন্ত ভাতটা শেষকালে চাপিয়েছিল। গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের স্বাদই আলাদা, তার সঙ্গে টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল, এ যে একেবারে অমৃত।

ছেলে-মেয়েরা ভালো করে খায়নি বলেই যেন ইরা আর প্রমিতার খাওয়ার রুচি নেই। সুতরাং শৈবালই-বা একগাদা খায় কী করে?

অত সাধ করে সে এনেছে ইলিশটা, তার ইচ্ছে ছিল এই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে। কিন্তু ইরা বা প্রমিতার মাছ বিষয়ে কোনো উৎসাহই নেই। শৈবাল দু-একবার বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মনে হল, হায়, বাঙালিরা আজকাল ইলিশ মাছের কথাও ভুলে যাচ্ছে! দু-পিস ইলিশের পেটি খাওয়ার পর আরও একখানা খাওয়ার জন্য তার মন কেমন করছিল, কিন্তু সে হাত গুটিয়ে ফেলল।

সব পর্ব চুকল সাড়ে এগারোটায়। এক্ষুনি শুয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না, ইদের চাঁদ উঠেছে আকাশে, ওরা এসে আবার বসল ছাদে। ইরা চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়, প্রমিতার ঝোঁক অতুলপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রগীতিতে। দুই সখী বেছে বেছে চাঁদ বিষয়ক গান শুরু করল একটার পর একটা। শৈবালের গলায় একদম সুর নেই তবু সে মুডের মাথায় ওদের এক একটা গানের সঙ্গে গলা মেলাতে গেলে ওরা দুজনেই হেসে ওঠে।

হঠাৎ শৈবালের মনে হল, আর দু-একজন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে এলে বেশ ভালো লাগত। তারপরেই শৈবাল ভাবল, দু-টি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আমি একমাত্র পুরুষ, এটাই তো অনেকের কাছে ঈর্ষার ব্যাপার।

গান থামিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রমিতা বলল, ওদের দুজনকে একসঙ্গে রান্নাঘরে অতক্ষণ থাকতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

ইরা বলল, হেনাকে তো আমি ওপরে শুতে বলেছিলাম, আবার নীচে-টীচে চলে যায়নি তো?

রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের গানের মাঝখানে ঝি-চাকরদের আলোচনা চলল একটুক্ষণ। নীচ থেকে রিন্টু ডেকে উঠল, মা, মা বলে।

ঘুম ভেঙে রিন্টু একবার হিসি করতে যায় রোজ এইসময়। একলা ঘরের বাইরে যেতে সে ভয় পায়। বাবলিকে তো শত ডাকলেও সে উঠবে না।

প্রমিতা নীচে চলে গেল। ছাদে শুধু ইরা আর শৈবাল। ইরা আবার গান গেয়ে যেতে লাগল আপনমনে। দু-টি গান শেষ করার পর সে জিজ্ঞেস করল, আপনি এত ঝিম মেরে গেলেন কেন? কথা টথা বলছেন না যে? ঘুম পেয়ে গেছে বুঝি?

চমকে উঠে শৈবাল বলল, না শুনছিলাম। এত ভালো গাইছেন–

চোখ বুজে আসছিল আপনার।

না না, ও এমনিই।

আমারও ঘুম পেয়ে গেছে, চলুন, উঠে পড়ি।

স্ত্রীর সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে নিরালায়, জ্যোৎস্নামাখা আকাশের নীচে কোথায় দু-একটা মধুর কথা বলবে শৈবাল, তা নয়, সে চোখ বুজেছিল!

সে শুধু বলল, আর একটু বসুন না। ততক্ষণে ইরা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, না এবার নীচে যাওয়া যাক।

এরপর নিজের ঘরটায় এসে শুয়ে পড়ে শৈবাল একটা ছোট্ট স্বপ্ন দেখল। ঠিক স্বপ্ন নয়, চোখ বুজে দেখা একটা চলন্ত ছবি।

কোথায় যেন জায়গাটা? কৃষ্ণনগরের কাছে, পারমাদান না? যাওয়া হয়েছিল জিপগাড়িতে, সব মিলিয়ে ন- জন, দারুণ ঠাসাঠাসি…সকাল বেলা বেরিয়ে ঘণ্টাচারেকের মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা, কিন্তু রানাঘাট না কোথায় যেন খারাপ হয়ে গেল জিপগাড়িটা, তার ওপরে আবার তুমুল বৃষ্টি। পোঁছোতে পোঁছোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। একটা ছোট্ট ডাকবাংলো। চৌকিদার বলল, এত লোকের রান্নার ব্যবস্থা নেই তার ওখানে, কিন্তু তা শুনে কেউ হৃক্ষেপও করল না, খাওয়া-দাওয়ার যেন কোনো চিন্তাই নেই, ও যা-কিছু একটা হয়ে যাবে। কেমিস্ট্রিতে ফাস্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্র দেবকুমারের যে অত গুণ, তা কে জানত? মাঠের মধ্যে ইট দিয়ে একটা উনুন বানিয়ে ফেলল চটপট। রাত্তিরে ওইখানে মুনলাইট পিকনিক হবে। শৈবালকে পাঠানো হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে। চৌকিদার কী যেন আপত্তি তুলেছিল, তাকে বলা হয়, চোপ!

রাত ন-টার পর বেরিয়ে গিয়ে কাছাকাছি গ্রাম থেকে মুরগি জোগাড় করে আনল দেবকুমার। ঠিক হল ছেলেরাই রাঁধবে, মেয়েরা দেখবে। ইরার সঙ্গে তখনও বিয়ে হয়নি দেবকুমারের। প্রমিতাকে সদ্য বিয়ে করেছে শৈবাল। আরও যে কারা ছিল, সুমন্ত্র, জয়া, মঞ্জু, অনীশ আর সুকুমার।

কাঠের আঁচ, বার বার নিভে যায়। শৈবালের ওপর ভার উনুনে কাঠ জোগানো শুধু! কারণ সে রান্নার কিছু জানে না। উনুনে ফুঁ দিতে দিতে তার চোখ লাল। রাত একটা বেজে গেল, তখনও শুধু ভাত হয়েছে, মাংস চাপেনি। তখন ইরা আর প্রমিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে এসে বলল, ঢের হয়েছে। এবার আপনারা উঠুন তো মশায়রা, এবার আমরা দেখছি।

খেতে বসা হল রাত আড়াইটেয়। প্রমিতা ঠাট্টা করে বলেছিল, আর একটু অপেক্ষা করলে এটাই আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট হয়ে যেত!

ভাতের তলায় পোড়া লেগে গিয়েছিল, ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ, তবু সে-ভাত সবই শেষ হয়ে গেল। চেটেপুটে খাওয়ার পর দেবকুমার বলেছিল, ইস, আর নেই? মাংসটা দারুণ রান্না হয়েছিল সত্যি।

কতদিন আগের কথা? তেরো না চোদ্দো বছর? সেই প্রমিতা আর ইরা কত বদলে গেছে। আজও চাঁদের আলো আছে, অথচ আজকের পিকনিক...

পাশ ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শৈবাল। সে নিজেও কী বদলে গেছে কম? সে এখন যেকোনো ব্যাপারে কিছু খরচ করতে গেলেই টাকার হিসেব করে। গান গাইতে গাইতে ইরা মনে করে শৈবাল গান শুনছে না, ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যিই তখন একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল শৈবালের।

ঘুমের মধ্যেই শৈবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরল।

পরদিন বাড়ি ফেরার পথে ইরা বলল, যাইহোক, বেশ কাটল এখানে। বেশ জমেছিল। মাঝে মাঝে এ-রকম বেরিয়ে পড়তে পারলে...।

গত রাতের স্বপ্নটা মনে পড়ায় মুচকি হাসল শৈবাল। জমেছিলই বটে। তবে বাচ্চারা বেশ আনন্দ করছে, ওদের তো সব কিছুতেই আনন্দ।

.

## ০৪.

কলকাতায় ফেরার দু-দিন পরেই আবার গন্ডগোল! অনন্তর জ্বর খুব বেড়েছে। সারা গায়ে ব্যথা। সকাল বেলা অনন্ত বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি, ঝিম মেরে শুয়ে থাকে। এ-রকম সে কক্ষনো করে না। বেশ সিরিয়াস ব্যাপার। ডাক্তার ডাকতে হবে। শৈবাল নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারুর অসুখ দেখলেই এ-রকম ব্যস্ত হয়ে ওঠা শৈবালের স্বভাব। সে নিজের ছেলেমেয়েরই হোক বা কাজের লোকেরই হোক।

পাড়ার একজন ডাক্তার শৈবালের বিশেষ চেনা, প্রায় বন্ধুর মতন। সুতরাং কোনো অসুবিধে নেই। সেই ডাক্তারটি ওদের বাড়িতে এসে দেখলেও চেম্বারের সমানই ভিজিট

নেন। সুতরাং অনন্তকে আর চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে না। চা খেয়েই শৈবাল বেরিয়ে ডাক্তারকে খবর দিয়ে এল। তিনি বললেন, বাড়ি ফেরার পথে এসে দেখে যাবেন।

শৈবাল ফিরে এসে দেখল, সিঁড়ি দিয়ে তার একটু আগে আগেই উঠছে প্রমিতার বান্ধবী ইরা। সঙ্গে সেই মেয়েটি, হেনা। শৈবাল মুচকি হাসল, তার কথা ঠিক মিলে গেছে। ইরা এরই মধ্যে ফেরত দিতে এসেছে মেয়েটিকে। ইরার বাড়িতে কিছুতেই লোক টেকে না!

ঠিক মেলেনি অবশ্য! ইরা ফেরত দিতে আসেনি হেনাকে। ওকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছে। তার আগে এবাড়িতে ঘুরে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। হেনা তার গামছা ফেলে গিয়েছিল এবাড়িতে, সেটা নিতে এসেছে। হেনার সঙ্গে একটা ছোটো জামাকাপড়ের পুঁটুলি ছিল। সেটা সে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ভুল করে গামছা রেখে গেছে।

বসবার ঘরে প্রমিতা, ইরা আর শৈবাল বসল। প্রমিতা হেনাকে বলল, বারান্দায় অনন্তর জামাকাপড় থাকে, দেখ সেখানে তোর গামছা আছে।

হেনা এসে দেখল সেখানে মাদুর পেতে শুয়ে আছে অনন্ত। চোখ দুটো লাল। এদিক ওদিক তাকিয়ে হেনা তার গামছাটা খুঁজে পেল না। অনন্তকে জিজ্ঞেস করতেও তার লজ্জা হচ্ছে! অনন্ত নিজেই জিজ্ঞেস করল, কী?

আমার গামছাটা।

অনন্ত আঙুল দিয়ে দেখাল, ওই যে।

এককোণে একটা খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট। অনন্ত যত্ন করে গামছাটা রেখে দিয়েছে। হেনা ভেবেছিল গামছাটা সে বোধ হয় আর পাবে না। অনন্ত সেটা ফেলে দেবে, কিংবা ঘর-মোছা করবে।

প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে হেনা একটু দাঁড়াল।

অনন্ত বলল, আমায় এক গেলাস জল এনে দেবে? ভীষণ গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা শুনে দুঃখের বদলে খুব লজ্জা হল হেনার। সে এবাড়িতে কাজ করে না। রান্নাঘর থেকে জল গড়িয়ে বাবু আর দিদিমণিদের সামনে দিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে? যদি কেউ কিছু ভাবে? অথচ কেউ জল চাইলে, জল না দিয়েও পারা যায় না। হেনাকে দেখেছে বলেই তো অনন্ত জল চেয়েছে। সে তো বাবু কিংবা দিদিমণিকে ডেকে জল চাইতে পারে না। চাকর-বাকররা অসুখ হলেও কি বাবুদের কাছে সেবা চায়?

রান্নাঘরে গেল জল গড়িয়ে আনতে। একটা গেলাস ভরে নিয়ে বেরিয়ে আসছে, অমনি প্রমিতা ঠিক দেখে ফেলেছে তাকে।

ও কী করছিস?

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল হেনা। দিদিমণির গলার ঝাঁঝ। সে কি কিছু অন্যায় করে ফেলেছে? কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, ওই যে ও, ও জল চাইছিল।

ও মানে কে?

ওই যে...অনন্ত।

প্রমিতা বলল, জল চাইছে অনন্ত? তুই এই গেলাসে–একবার আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারিস না? অনন্তর তো আলাদা গেলাস আছে সেটাতে দিবি তো। এটা তো বাবুর গেলাস। রান্নাঘরে দেখ একটা কলাই-করা গেলাস আছে।

ইরা ধমক দিয়ে বলল, তুই আগে আমাদের বলবি তো। আগেই নিজে সর্দারি করে গেলাস নিতে গেছিস কেন?

সেকথাটাই তো ভাবছিল হেনা। চাকর-বাকররা জল চাইলে সেকথা কি বাবুদের বলা যায়? তার সামান্য বুদ্ধিতে এর উত্তরটা খুঁজে পায়নি।

কলাই-করা গেলাসটা খুঁজে পেয়ে তাতে করে জল এনে দিল হেনা। কোনোরকমে মাথা উঁচু করে জলটা খেল অনন্ত। এক দিনের জ্বরেই সে বেশ কাবু হয়ে গেছে। এক চুমুকে জলটা শেষ করে সে বলল, ওঃ।

হেনার ইচ্ছে হল অনন্তকে একটা-কিছু বলে। কোনো সান্ত্বনা দেয় কিন্তু কোনো কথাই তার মনে এল না।

এইসময় ইরা ডাকল, হেনা, হেনা! গামছা পেয়েছিস?

হেনার কিছুই বলা হল না।

ইরারা চলে যাওয়ার পর শৈবাল বলল, বাবা, কী কঞ্জুস তোমার বান্ধবী। একটা গামছাও কিনে দিতে পারে না? সেজন্য এতদূর এসেছে!

এ ব্যাপারটা প্রমিতারও দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাই সে বান্ধবীর সমর্থনে কোনো কথা বলতে পারল না। একটা পুরোনো গামছার জন্য এতদূর আসা মোটেই মানায় না ইরাকে। অথচ ইরা মোটেই কৃপণ নয়। যখন-তখন টাকাপয়সা হারায়। বন্ধুবান্ধবদের দামি দামি জিনিস উপহার দেয়।

শৈবালই আবার বলল, অবশ্য সপ্তাহে দু-তিনবার ঝি-চাকর বদলালে কতজনকেই-বা গামছা কিনে দেবে! ইরা বোধ হয় যাচাই করে দেখতে এসেছিল, ওই মেয়েটা সত্যিই গামছা ফেলে গেছে না মিথ্যেকথা বলেছে।

প্রমিতা বলল, তোমার সঙ্গে আমার গল্প করলে চলবে না। রান্না করতে হবে। আজ শুধু ফেনাভাত খেয়ে যেতে পারবে তো?

অনন্তর জ্বর ক-দিনে ছাড়বে তার ঠিক নেই। সে-ক-দিন প্রমিতাকেই রান্না করতে হবে। সেজন্য প্রমিতা অবশ্য খুব-একটা বিরক্ত নয়। অনন্ত প্রায় বাড়ির ছেলের মতন হয়ে গেছে। অনেক লোকজন ছাড়াবার পর ওকে এখন খুব পছন্দ হয়েছে শৈবালেরও। এ-রকম শান্ত নিরীহ লোক আর পাওয়া যাবে না।

ইচ্ছে করলে প্রমিতা বেশ দ্রুত হাতেই রান্নার কাজ সেরে ফেলতে পারে। ইস্কুল-অফিসের ঠিকসময়ে সে খাবার দিয়ে দিল।

শৈবাল বলল, এখন ক-দিন তোমায় রান্না করতে হয় দেখো।

প্রমিতা বলল, সে আমি ঠিক চালিয়ে দেব।

যাওয়ার সময় শৈবাল বলল, ডাক্তার এলে জিজ্ঞেস করে নিয়ো, অনন্ত কী খাবে।

প্রমিতা বলল, দুধ পাউরুটি দিয়ে দেব নাহয়।

অফিসে কাজের মধ্যে সবেমাত্র ডুব দিয়েছে শৈবাল, এইসময় বাড়ি থেকে ফোন এল! প্রমিতা ভয়ে প্রায় চিৎকার করছে। তক্ষুনি সে শৈবালকে একবার বাড়ি চলে আসবার জন্য অনুরোধ করছে!

আবার গোলমাল। দারুণ গোলমাল। ডাক্তারবাবু এসে বলে গেছেন, অনন্তর পক্স হয়েছে।

# ৫-৬. অনন্তর দেশ

অনন্তর দেশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোনো এক গ্রামে। বছরে সে দু-বার মাত্র ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়। এবং খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সে দশ দিনের ছুটি নিয়ে গেলে ঠিক দশ দিন বাদেই ফিরে আসে। এমন আর দেখা যায় না। প্রমিতার চেনাশোনা আত্মীয়স্বজনের সব বাড়ির কাজের লোক একবার ছুটি নিলে আর সহজে ফেরে না। অনেকে ছুটির নাম করে পালিয়ে যায়। ছোটোমাসির বাড়ির কাজের লোক অর্থাৎ চাকরটি দেশে তার মায়ের অসুখ বলে ছুটি নিয়ে গেল। দু-দিন বাদেই দেখা গেল সে লেকে কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোটোমাসির ছেলেকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে কেয়াতলায় অন্য এক বাড়িতে কাজ করছে।

প্রমিতার দিদির বাড়ির কাজের লোকটি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কারণ ওবাড়িতে টেলিভিশন নেই। প্রমিতার জামাইবাবু টেলিভিশন কিনতে পারেন ঠিকই কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনো নষ্ট হবে বলে কিনছেন না। প্রমিতার দিদি এখন রোজই বলেন, টেলিভিশন না কিনলে আর বাড়িতে ঝি-চাকর টিকবে না।

সেদিক থেকে অনন্ত সত্যিই ব্যতিক্রম। শৈবালের টিভি নেই, অনন্ত তবু তো কাজ ছেড়ে চলে যায়নি!

প্রমিতা ফিসফিস করে শৈবালকে বলল, তুমি ওকে ওর দেশে পৌঁছে দিয়ে এসো।

শৈবাল আকাশ থেকে পড়ল! অনন্তকে দেশে পৌঁছে দিয়ে আসব! কেন?

প্রমিতা বলল, বাড়িতে দুটো ছেলে-মেয়ে রয়েছে, আর এখানে একটা পক্সের রুগি রাখা যায় নাকি? কর্পোরেশনের লোক খবর পেলে তো ওকে এমনিতেই ধরে নিয়ে যাবে। তুমি বরং ওকে দেশে দিয়ে এসো।

প্রমিতা বেশ উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু পৃথিবীর অনেক কিছুরই খবর রাখে না। কলকাতায় কর্পোরেশন বলে কিছু আর নেই, আছে কিনা নির্বাচনের এক জিনিস, তার নাম পুরসভা, তারা পক্সের রুগি তো দূরের কথা, রাস্তার পাগলা কুকুরও ধরে না।

শৈবাল বলল, বিশ্বাসী লোকটাকে তুমি গ্রামে পাঠাবে, ওখানে ওর চিকিৎসা হবে কী করে?

তা বলে এমন একটা রুগি- বাড়িসুদ্ধু সবাই মরবে?

শৈবাল ধীরস্বরে বলল, ওর হয়েছে চিকেন পক্স তাতে মানুষ মরে না।

তুমি কী করে জানলে?

স্মল পক্স পৃথিবী থেকে উঠে গেছে।

তুমি ছাই জানো!

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে নাও।

চিকেন পক্সই-বা কম কীসে? জ্বর হবে, ভোগাবে, দুর্বল করে দেবে-তুমি তো ছেলে মেয়ের কথা একদম ভাবো না

শোনো, চিকেন পক্স তো শুধু অনন্তর একলার হয়নি। ও একটা হাওয়া আসে। একবার হতে শুরু করলে অনেকের হয়, ওর থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না।

মোটকথা আমি বাড়িতে পক্সের রুগি রাখব না।

আমার পক্স হলে তুমি আমাকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে?

প্রমিতা এবার অসম্ভব রেগে উঠে বলল, বাজেকথা বলবে না বলছি! ওরকম বড়ো বড়ো কথা সবাই বলতে পারে। সংসারটা আমায় সামলাতে হয়, ছেলে-মেয়ের অসুখ হলে কে দেখবে? সামনে রিন্টুর পরীক্ষা

শৈবাল চুপ করে গেল। এসব ক্ষেত্রে নীরবতাই স্বর্ণময়।

তুমি কাল সকালেই ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

এবার শৈবালের রেগে ওঠার পালা।

তুমি বলতে চাও, আমি ওকে সঙ্গে করে ট্রেনে সেই পাথরপ্রতিমা না কোথায় যাব? শুনেছি, ট্রেনের পর লঞ্চ, তার থেকে নেমেও আবার মাইলতিনেক হাঁটতে হয়। সেই রাস্তাটা কি আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাব?

তুমি না গেলে কে যাবে বলো?

আমার অফিস-টফিস নেই, কাজকর্ম নেই, আমি চাকরকে বাড়ি পৌঁছোতে যাব?

একদিন অফিসের ছুটি নিতে পারনা?

শোনো প্রমিতা, একটা সাধারণ কথা বোঝার মতন বুদ্ধি তোমার নেই কেন? আমি যদি ওকে বাড়ি পৌঁছোতে যাই, ট্রেনে লঞ্চে ওর কাছাকাছি থাকি, তাহলে ওর ছোঁয়াচ লেগে তো আমারও পক্স হতে পারে।

তাহলে অন্য কারুকে দিয়ে পাঠানো যায় না?

কাকে দিয়ে পাঠাব বলো?

অন্য কোনো ফ্ল্যাটের কাজের লোক, যারা ওর বন্ধু-টন্ধু, তাদের কারুকে যদি ডেকে একটু বলল, কিছু টাকা দেওয়া হবে তাকে।

আমি এখন অন্য বাড়ির চাকরদের ডেকে ডেকে অনুরোধ করতে যাই আর কী! ওসব আমার দ্বারা হবে না।

প্রমিতা উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে এমন জোরে দরজাটা বন্ধ করল, সেটা ভেঙে পড়বার উপক্রম।

শৈবাল অনন্তকে দেখার জন্য বারান্দার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। ছেলেটা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। শৈবাল দু-একবার ডাকল নাম ধরে। অনন্ত শুধু উ উ শব্দ করল। মনে হয় ছেলেটার খুব জ্বর।

চিকেন পক্স একবার বাড়িতে ঢুকলে সকলকে না-শুইয়ে ছাড়বে না। তবে অনন্তরই যে কেন আগে হতে গেল! আগে যদি এ বাড়ির অন্য কারুর হত, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকত না–

দু-একটা টুকিটাকি কাজ সারবার জন্য শৈবালকে বেরোতে হল একটু। ফিরে এসে দেখল, এর মধ্যেই প্রমিতা অনেকখানি ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

অনন্ত ফ্ল্যাটে কোথাও নেই। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একতলার সিঁড়ির নীচে। জায়গাটা খুবই ছোটো, একজন মানুষ কোনোক্রমে গুটিশুটি মেরে শুতে পারে।

সন্ধ্যে বেলা হয়তো অনেকে নজর করবে না। সকাল বেলা ওখানে একজন পক্সের রুগিকে দেখলে বাড়ির অন্যান্য লোক নিশ্চয়ই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

প্রমিতার এমনিতে বেশ দয়ামায়া আছে। অনন্তর প্রতি তার স্নেহের অভাব ছিল না। তবু সে অনন্তকে ওরকম একটা ঘুপসি অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাল?

ছেলে-মেয়ের চিন্তায় প্রমিতা আর সবকিছু ভুলে যায়। ছেলে-মেয়ে একদিকে, আর সারাপৃথিবী অন্য দিকে।

এই পরিবারের মধ্যে শুধু প্রমিতারই একবার চিকেন পক্স হয়ে গেছে ছেলেবেলায়। সুতরাং আর তার ভয় নেই বোধ হয়। চিকেন পক্স সকলের একবার করে হলেই চুকে যায় ঝঞ্ঝাট। এদেশে সকলের একবার-না-একবার তো হবেই।

শৈবাল ভাবল, তার নিজের এখন চিকেন পক্স হয়ে গেলে বেশ হয়। তাহলে আর অনন্তকে সরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না। সে নিজেও কিছুদিন অফিসের কাজ থেকে বিশ্রাম পাবে। এমনিতে তো ব্যাটারা কিছুতেই ছুটি দেবে না।

প্রমিতা টেলিফোন করায় ব্যস্ত। যেরকম লম্বা সময় টেলিফোন চলছে, তাতে এক দিকের কথা শুনেই শৈবাল বুঝল যে, বাক্যালাপ চলছে ইরার সঙ্গে।

রিন্টু আর বাবলি খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করছে দেখে শৈবাল একটা ইংরেজি গোয়েন্দা নভেল খুলে বসল। কিন্তু তার শান্তি বিঘ্নিত হল অচিরেই।

টেলিফোন ছেড়ে এসে প্রমিতা বলল, তুমিই তো এর জন্য দায়ী।

শৈবাল চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল। তার মাথা থেকে তখনও গোয়েন্দা গল্পের ঘোর কাটেনি। কী ব্যাপার?

তুমিই তো মেয়েটাকে রাখতে দিলে না!

কোন মেয়েটাকে?

মেয়েটা থাকলে এখন কত উপকারে লাগত। এখন একহাতে আমি কতদিক সামলাই? তুমি বলতে লাগলে, মেয়েটাকে তাড়াও, তাড়াও।

আমি মেয়েটাকে তাড়ালাম। ওই হেনা না, কী যেন মেয়েটা? তুমি তো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ খুলে বাড়ি বাড়ি মেয়েটাকে পাঠাতে লাগলে

মোটেই না, আমি বলেছিলাম আর দু-একদিন থাকুক। ইরাকে ফোনে সব জানালাম, ভাবলাম, ইরা যদি মেয়েটাকে ফেরত দেয়।

ইরা তো মেয়েটিকে পছন্দ করেনি। কাজকর্ম ভালো পারে না বলছিল, তা ওর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে এসো-না।

ইরা ফেরত দিলে তো। আমার অসুবিধের কথা বুঝলই না, এখন একেবারে মেয়েটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তাহলে একটা নারীহরণ করা যাক। ইরার বাড়ি থেকে ওই হেনাকে আমি জোর করে আনি।

কী বললে?

বলছি যে, ওবাড়ি থেকে ওই হেনাকে আমি ফুসলে কিংবা জোর করে নিয়ে আসব?

তুমি সবটাতেই ইয়ার্কি করবে?

শৈবাল বুঝল যে ব্যাপার বেশ গুরুতর। আর হালকা সুরে কথা বলতে গেলে প্রমিতার মেজাজ এমনই হয়ে যাবে যে, তখন ধাক্কা সামলাতে হবে শৈবালকেই। সে এবার খানিকটা সহানুভূতির সুরেই বলল, এত লোককে কাজের লোক সাপ্লাই করো, এখন তোমার এই বিপদের সময় কেউ সাহায্য করবে না?

প্রমিতা ছোট্ট করে বলল, দেখোনা।

তোমার মাকে খবর দাও না। তিনি যদি কোনো লোক পাঠাতে পারেন।

প্রমিতা আবার কণ্ঠস্বর উগ্র করল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, তোমার যেমন বুদ্ধি! মা যদি শোনেন যে অনন্তর পক্স হয়েছে, আর তবুও তাকে আমি এবাড়িতে রেখেছি, তাহলে আমায় এমন বকুনি দেবেন। তোমার মতন তো সবাই না, আর সবাই বাড়ির লোকের ভালো-মন্দ বিষয়ে চিন্তা করে।

শৈবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, সবাই যদি শুধু নিজের বাড়ির লোকের ভালো-মন্দ বিষয়েই চিন্তা করবে, তা হলে অনন্তর মতন যারা বাড়ি ছেড়ে দূরে কাজ করতে এসেছে, তাদের জন্য চিন্তা করবে কে?

প্রমিতা বলল, আজ রাত্তিরে বাইরে খাব। অনেক দিন তো আমাদের কোথাও নিয়ে যাওনি। রিন্টুটা এত চীনে খাবার ভালোবাসে! প্রায়ই বলে মা, সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার ডিশ খাব।

তার মানেই একগাদা টাকা গচ্চা। প্রমিতার রান্না করার ইচ্ছে উধাও হয়ে গেছে। সেইজন্য হোটেলে খেতে হবে। অথচ না বলাও চলবে না। তাহলেই প্রমিতা তাকে কৃপণ বলে গঞ্জনা দেবে। অন্যের উদাহরণ দিয়ে খোঁচা মারবে। হাতের কাছেই তো জামাইবাবু অর্থাৎ মণিদা রয়েছেন। প্রমিতা বলল, মণিদা প্রায়ই দিদি আর বাচ্চাদের বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যান, তুমি নিজে থেকে একদিন...

শৈবালও যে মাঝে মাঝে প্রমিতাদের নিয়ে চীনে দোকানে খেতে গেছে, সেকথা এখন প্রমিতার মনেই পড়বে না।

অনেক মেয়ে টাকার ব্যাপারটা কিচ্ছু বোঝে না। কোথা থেকে টাকা আসে, সৎভাবে উপার্জন করতে গেলে যে কত মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে হয়, সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। যখন যেটা দরকার, তখন সেটা পেতেই হবে। এইসব মেয়েরা বেশিদিন সুন্দরী থাকে। তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে না। স্ত্রীকে বেশি দিন সুন্দরী রাখার জন্য শৈবালকে আরও কষ্ট করে টাকা রোজগার করতে হবে।

মুখে একটা কৃত্রিম খুশির ভাব ফুটিয়ে সে বলল, গুড আইডিয়া। তাহলে আর বেশি রাত করে লাভ নেই, তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

কোথাও বেরোতে গেলেই প্রমিতা আগে একবার বাথরুমে ঢুকে গা ধুয়ে নেয়। প্রমিতার স্নান করতে লাগে পাক্কা এক ঘণ্টা দশ মিনিট, আর সন্ধ্যের পর গা ধুতে পঁয়তিরিশ থেকে

চল্লিশ মিনিট। অনেকক্ষণ ধরে বাথরুমের মধ্যে কোনো জলের আওয়াজ থাকে না, নিথর, নিস্তব্ধ, সেইসময় মেয়েরা বাথরুমে কী করে তা জানবার জন্য শৈবালের দারুণ কৌতূহল। এক-একসময় সে ভাবে, বাথরুমের দরজায় একটা ছোট্ট ফুটো করে সে ভেতরটা দেখবে সেইরকম সময়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রমিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন সেরে নিচ্ছে। চীনে দোকানে খেতে গেলে সাজগোজ করে যাওয়াই নিয়ম। বাথরুম থেকে বেরোবার ঠিক পরের সময়টায় প্রমিতাকে খুব ঝকঝকে তকতকে দেখায়।

ঠিক সেই সময় প্রতিবারেই শৈবালের খুব ইচ্ছে করে প্রমিতাকে নিবিড়ভাবে আদর করতে। এমনকী শুয়ে পড়তে। কিন্তু উপায় নেই। জড়িয়ে ধরতে গেলেই প্রমিতা আপত্তি জানায়। তার সাজ নষ্ট হয়ে যাবে। বিবাহিতা মেয়েদের সাজসজ্জা মোটেই তাদের স্বামীদের জন্য নয়। অন্যদের জন্য। অন্যরা দেখবে। তবু বেচারি স্বামীদের দামি শাড়ি দিতে হয়। এবং স্নো- পাউডার, পারফিউম ইত্যাদি।

খুব আলতোভাবে প্রমিতার ঘাড়ে একটা চুমু খেয়ে শৈবাল বলল, তোমায় একটা বুদ্ধি দেব?

কী?

তোমার বান্ধবী ইরাকে ফোন করে একটা গল্প বলো। ওকে বলল যে, তোমার একটা সোনার দুল চুরি গেছে। এবং তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই হেনা নামে মেয়েটাই নিয়েছে।

তার মানে? হঠাৎ একথা বলব কেন?

ইরা তো ভীষণ ভুলোমন। ওর সবসময়ই কিছু-না-কিছু জিনিস হারায়। তোমার কথা শুনলেই ওর কোনো হারানো জিনিসের কথা মনে পড়ে যাবে। আর ভাববে, হেনাই সেটা চুরি করেছে। ইরা যখন-তখন রেগেও যায়। একবার ওই মেয়েটাকে সন্দেহ করলে অমনি

মেয়েটার ওপর খুব রেগে যাবে, আর পত্রপাঠ তাকে বিদায় করবে। আর আমরা অমনি মেয়েটাকে লুফে নেব।

প্রমিতা এবার মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলে বলল, তোমার যতসব উদ্ভট কথা। তুমি ইরার চরিত্রটা ভালো স্টাডি করেছ তো।

ভালো বুদ্ধি দিয়েছি কি না বল?

ধ্যাৎ! আমি মোটেই ওরকম মিথ্যেকথা বলতে পারব না।

তাহলে আমি বলি?

না। শুধু শুধু একজনের নামে দোষ চাপাবে? তোমার লজ্জা করে না? আমি এসব একদম পছন্দ করি না।

একজনের নামে চুরির অপবাদ দেওয়া যদি দোষের হয়, তাহলে একজন বিশ্বস্ত কাজের লোককে সামান্য চিকেন পক্স হওয়ার অপরাধে তাড়িয়ে দেওয়া দোষের নয় কেন, তা বোঝা শৈবালের অসাধ্য।

চীনে দোকানে খাওয়ার পর্ব বেশ ভালোভাবেই চুকল। শুধু শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল রিন্টু। তাকে কোলে নিতে হল শৈবালকে। রিন্টু এখন বেশ বড়ো হয়েছে, তাকে বেশিক্ষণ কোলে নিলে শৈবাল হাঁপিয়ে পড়ে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। রিন্টুকে কাঁধে নিয়ে সেই অবস্থায় শৈবালকে ট্যাক্সির পেছনে দৌড়াদৌড়ি করতে হল অনেকক্ষণ। চৌরঙ্গি পাড়ায় এমন ন্যাবড়া- জ্যাবড়াভাবে ঘোরা একটা বিশ্রী ব্যাপার, অফিসের কেউ হঠাৎ দেখে ফেললে কী ভাববে?

মোটের ওপর শৈবাল মনে মনে বেশখানিকটা বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। ঠোঁটে তার হাসি আঁকা রইল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আগামী কালও যদি কোনো রান্নার লোক না পাওয়া যায় আর প্রমিতা রান্নার ব্যাপার নিয়ে গজগজ করে, তাহলে সে নিজেই রাঁধতে শুরু করবে। শৈবাল এক সময়ে বয় স্কাউট ক্যাম্পে এমন মুসুরির ডাল রেঁধেছিল যে সবাই ধন্য ধন্য করেছিল এবং মেরিট ব্যাজ দেওয়া হয়েছিল তাকে।

নাহয় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করে অফিস থেকে ছুটিই নেবে সাত দিন। তা বলে রোজ রোজ তো বাইরের হোটেলে সপরিবারে খেয়ে সে সর্বস্বান্ত হতে পারে না।

প্রমিতা যে রান্না জানে না তাও নয়। ভালোই জানে। যেকোনো একটা আইটেম রান্নায় তার হাত খুব চমৎকার। চিকেন স্টু, দই-পোনামাছ কিংবা নারকেলবাটা-চিংড়ি তার হাতে অপূর্ব। কিন্তু ভাত, ডাল, ছেঁচকি, তরকারি, মাছের ঝোল–এইসব রান্না তার কাছে অসহ্য। যদি বাধ্য হয়ে রাঁধতেই হয়, তাহলে তার এমন মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে যে, তার ঠেলা সামলাতে শৈবালকে অন্তত আড়াইশো টাকা দামের শাড়ি কিনে দিতে হবে। রোজ রোজ তো আর কেউ চিকেন স্টু কিংবা দই-পোনামাছ খেয়ে কাটাতে পারে না!

মাঝরাতে ঘুমন্ত শৈবালকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে প্রমিতা উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, এই, এই শোনো।

শৈবাল ধড়মড় করে উঠে বলল, কী? কী হয়েছে?

একবার পাশের ঘরে এসো তো।

কেন?

এসো-না!

আরে কেন বলবে তো? কী মুশকিল।

দেখো তো রিন্টুর জ্বর হয়েছে কি না। মনে হচ্ছে যেন গা-টা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

এবার ভালো করে ঘুম ভাঙল শৈবালের। খাট থেকে নেমে পড়ে বলল, কই, চলো তো দেখি।

পাশের ঘরে পাশাপাশি দু-খানি খাটে ঘুমোচ্ছে রিন্টু আর বাবলি।

প্রমিতা রিন্টুকেই বেশি ভালোবাসে। দুই ভাই-বোনে ঝগড়া হলে প্রমিতা ঠিকমতন বিচার না করে বেশিরভাগ সময়েই বকে বাবলিকে।

সেজন্যই বোধ হয় বাবলির প্রতি শৈবালের বেশি টান।

প্রমিতা বলল, আমি দু-বার উঠে এসে এসে দেখলাম।

শৈবাল রিন্টুর কপালে হাত রাখল। একেবারে স্বাভাবিক তাপ। না না, কিছু হয়নি।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখব?

কোনো দরকার নেই। আমি বলছি তো ঠিকই আছে।

রিন্টুর কপালে একটা কাল্পনিক ফুসকুড়ির ওপর হাত রেখে প্রমিতা আবার ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, দেখো তো, এখানে একটা গোটা উঠছে না?

শৈবাল রিন্টুর কপালে ভালো করে হাত বুলিয়ে কোথাও কিছু পেল না।

প্রমিতা রিন্টুর জামার বোতাম খুলে বুকে হাত বুলিয়ে ফুসকুড়ি খুঁজতে লাগল। দৃশ্যটা হঠাৎ খুব ভালো লেগেছে শৈবালের। প্রমিতা এখন খাঁটি মাতৃমূর্তি। মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য অকারণে উদবিগ্ন। বাবারা এতটা পারে না।

শৈবাল একবার বাবলিরও কপালে হাত দিয়ে দেখল। না, বাবলির জ্বর আসেনি!

প্রমিতার পিঠে হাত দিয়ে সে কোমল গলায় বলল, চলো, ঘুমোবে চলো। কিছু হয়নি ওদের। তা ছাড়া হলেই-বা কী? বলেছি তো, চিকেন পক্স হলেও ভয়ের কিছু নেই।

ছেলে-মেয়েদের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রমিতা তার স্বামীর বুকে মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

.

## ০৬.

শৈবাল যা আশঙ্কা করেছিল সকাল বেলাতেই ঠিক তাই ঘটল।

রিন্টু বাবলি কারুরই জ্বর হয়নি বা শরীরে গোটা বেরোয়নি, ওরা দু-জনেই তৈরি হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার জন্য। প্রমিতার মনটা খুশি খুশি আছে।

আজ প্রমিতা ঘুম থেকে উঠেছে সকলের আগে, আর চা বানিয়েছে সে নিজে। প্রমিতার চায়ের হাতটা বেশ মিষ্টি।

বাবলি বাথরুমে ঢুকেছে তাই শৈবাল খবরের কাগজটা পড়ছিল। সামনে তার দ্বিতীয় কাপ চা। মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছে, বাবলি, তাড়াতাড়ি করো।

এমন সময় তিন তলার ভাড়াটে হিমাংশুবাবুর প্রবেশ।

হিমাংশুবাবুর বয়স শৈবালের চেয়ে কিছু বেশি। রোগা, লম্বাটে চেহারা। সকাল বেলাটা উনি পাজামার ওপর হাওয়াই শার্ট পরে থাকেন। ওই সাজেই তিনি খুব ভোরে বাজারে যান।

শৈবালের মতো এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করতেন হিমাংশুবাবু। কিছুদিন হল সে, চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করেছেন। খুব তাড়াতাড়িই সে-ব্যাবসাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। মনে হয়, কেন না, গতমাসে তিনি একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিনেছেন।

শৈবাল হিমাংশুবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, আরে, এই যে আসুন! আসুন!

হিমাংশুবাবু চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, অফিস যাবেন না?

শৈবাল বলল, হ্যাঁ। এইবার তৈরি হব।

আপনাদের অফিসের সেনগুপ্ত শুনলাম ব্রিটিশ কেবলসে জয়েন করেছে?

এখনও করেনি, তবে সেইরকমই শুনছি।

একদিন একটু সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল। আবার গরম। এই সময়টা খুব খারাপ।

হুঁ।

তার ওপর আবার লোডশেডিং! ওঃ।

শৈবাল আড়ষ্ট হয়ে রইল। হিমাংশুবাবু নিশ্চয়ই এইসব এলোমেলো কথা বলতে আসেননি। অফিসের দিনে সকাল বেলা কেউ এ-রকম আমড়াগাছি গল্প করতে আসে না। হিমাংশুবাবুও তো চাকরি করতেন।

এক কাপ কফি খাবেন নাকি?

থাক, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে।

আরে না না, এক কাপ কফি খাবেন, তাতে আর কী দেরি।

শৈবাল সতর্ক হয়েই চায়ের বদলে কফির কথা বলেছে। চা বানাতে দেরি লাগে আর কফি তো একটু গরম জলে নেসকাফে গুলে দিলেই হয়। প্রমিতা ব্যস্ত থাকলে শৈবাল নিজেই বানিয়ে দিতে পারবে।

হিমাংশুবাবু বললেন, কফি আমার ঠিক সহ্য হয় না। চা হলে খেতে পারি।

প্রমিতা মিথ্যেকথা বলা পছন্দ করে না। কিন্তু শৈবাল অফিসে চাকরি করে, প্রায়ই নানা কারণে তাকে মিথ্যে বলতে হয়। প্রমিতা কাছাকাছি নেই দেখে সে মুখে দারুণ একটা লজ্জিত ভাব ফুটিয়ে বলল, এই রে, বাড়িতে যে আর চা নেই। লাস্ট কাপ আমিই খেয়ে ফেললাম!

থাক, থাক তাহলে।

চা বানাতে গেলে হিমাংশুবাবুর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে হত। সেটা এড়ানো গেল। এবার আসল কথা। শৈবাল ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল হিমাংশুবাবুর মুখের দিকে।

আপনার এখানে যে কাজ করে, অনন্ত নাম না? অনন্তকে দেখলাম সিঁড়ির নীচে শুয়ে আছে।

শৈবাল শঙ্কিতভাবে চুপ করে রইল।

ওর সারামুখে গোটা...পক্স হয়েছে?

হ্যাঁ। চিকেন পক্স।

সুযোগ পেলে অনেকেই দয়ালু এবং মানবদরদি সাজতে চায়। শৈবালের দিকে একটা ভর্ৎসনার দৃষ্টি দিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন, সিঁড়ির নীচে ওইটুকু জায়গা, তারমধ্যে ঘুচিমুচি হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা, জ্বরে কোঁকাচ্ছে, ওকে ওইভাবে ফেলে রেখেছেন?

শৈবাল অপরাধীর মতন চুপ করে রইল।

হাজার হোক একটা মানুষ তো। ঝি-চাকর...ওরা আমাদের বাড়িতে কাজ করে, আমরাও যদি ওদের না দেখি...

ওকে ডাক্তার দেখিয়েছি ওষুধও খাওয়ানো হচ্ছে।

তা বলে ওইরকম একটা অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর জায়গায় ফেলে রাখবেন!

এইবার শৈবাল পালটা চাল দিল। সে বিনীতভাবে বলল, কী করা যায় বলুন তো! কোনো হাসপাতালে নেবে না। ফ্ল্যাটের মধ্যে এনে রাখাও সম্ভব নয়, আমার ছোটো ছেলে-মেয়ে আছে।

এবার হিমাংশুবাবু স্বমূর্তি ধরলেন। একটু উগ্রভাবে বললেন, তাবলে কমন প্যাসেজের কাছে ওকে ফেলে রাখবেন? সারাবাড়িতে রোগ ছড়াবে! আপনার ফ্ল্যাটে ছোটো ছেলে-মেয়ে আছে, আমার ফ্ল্যাটে নেই। আমার ছোটো মেয়েটার আবার সামনেই পরীক্ষা!

অর্থাৎ মানবদরদ-টরদ কিছু না, নিজেদেরও রোগ হওয়ার ভয়।

এই সময় শয়নকক্ষ থেকে প্রমিতা এসে সেখানে দাঁড়াল।

প্রমিতা যাতে চায়ের প্রস্তাব দিয়ে না বসে, সেইজন্য শৈবাল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হিমাংশুবাবু কফি-টফি কিছু খাবেন না বলছেন।

হিমাংশুবাবু প্রমিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, অনন্তর কথা বলছিলাম। সিঁড়ির নীচে পড়ে আছে, দেখতেও খারাপ লাগে, সারাবাড়িতে রোগ ছড়াবে। কাজরির সামনেই পরীক্ষা, এখন পক্স-টক্স হলে কী হবে বলুন তো!

প্রমিতা নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে অম্লান মুখে বলল, দেখুন-না। আমিও সেই কথাই বলেছিলাম ওকে, একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে

শৈবাল শুকনো গলায় বলল, কী ব্যবস্থা করা যায় শুনি?

প্রমিতা এবং হিমাংশুবাবু প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠলেন, ওকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

শৈবাল বলল, ওর বাড়ি অনেক দূর। এই অবস্থায় ও তো একা যেতে পারবে না, সঙ্গে কারুর যাওয়া দরকার। কে যাবে?

এবার প্রমিতা চুপ করে গেল। হিমাংশুবাবু বললেন, সে একটা কিছু উপায় তো করতেই হবে। এ-রকম ভাবে তো ফেলে রাখা যায় না। সারাবাড়ির একটা রিস্ক। এবাড়িতে আরও অনেক লোক থাকে।

অর্থাৎ তোমার বাড়ির চাকর, সুতরাং তার সব দায়িত্ব তোমার। আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কেন?

রাগ চাপবার জন্য শৈবাল ফস করে একটা সিগারেট ধরাল।

হিমাংশুবাবু আফশোসের সুরে বললেন, বাজার যাওয়ার পথে আমি ওকে লক্ষই করিনি। বাজারে আজ বড়ো বড়ো মাগুর মাছ উঠেছে, দামও তেমন চড়া নয়, এক কিলো কিনে ফেললাম। কী কান্ড বলুন তো? এখন সে মাছ কে খাবে? বাড়িতে পক্স হলে মাছ-মাংস কিছুই খেতে নেই। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখছি, বাড়িতে পক্স হলে বাপ-মা আমাদের নিরামিষ খাওয়াতেন।

প্রমিতা যেন লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশে গেল।

শৈবাল মনে মনে হিমাংশুবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি একটি গর্দভ, তোমার মাথায় গোবর পোরা!

একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে শৈবাল পড়েছে যে, পক্সের সময় বেশি করে মাছ-মাংস খেতে হয়। আগেকার দিনে গ্রামের লোক যে-পুকুরে পক্সের রুগির কাপড়চোপড় ধুতো, সেই

পুকুরের মাছ খেতো না! কলকাতার বাজারে সব মাছ আসে ভেড়ি থেকে, সে মাছের কিছু দোষ নেই। বেশি করে প্রোটিন খেলে পক্স আটকানো যায়। যারা গোরু-শুয়োরের মাংস বেশি খায়, তাদের সচরাচর পক্স হয় না। শৈবাল নিজেই তো ভেবেছিল, আজ নিউ মার্কেট থেকে ফেরবার পথে এক কিলো গোরুর মাংস কিনে আনবে। গোরুর মাংসে বেশি প্রোটিন থাকে। প্রমিতাকে অবশ্য বলত, ভেড়ার মাংস।

হিমাংশুবাবু তাঁর এক কিলো মাগুর মাছ এ ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিলে শৈবাল খেয়ে বাঁচত। মাগুর মাছ তার খুব পছন্দ। পঁচিশ টাকা কেজি বলে সে প্রাণেধরে কিনতে পারে না। কিন্তু সেকথা হিমাংশুবাবুকে মুখ ফুটে বলা যাবে না।

হিমাংশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। আমাদের সকলের স্বার্থে।

হ্যাঁ, স্বার্থে। স্বার্থের কথাই যখন বলতে এসেছিলেন তখন গোড়ায় লম্বা লেকচার মারছিলেন কেন?

শৈবাল গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ, দেখছি। আমি অফিস যাওয়ার আগেই একটা-কিছু ব্যবস্থা করছি।

হিমাংশুবাবু চলে গেলে প্রমিতা বলল, তোমার আজ অফিস না-গেলে চলে না?

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে তো ফোন করে একটা-কিছু বলতে হবে। এমনি এমনি তো ডুব মারা যাবে না। তা ফোন করে কী বলব চাকরের পক্স হয়েছে বলে আমি আজ অফিসে যেতে পারছি না। উনি যদি হেসে ওঠেন?

তোমার তাহলে যা-খুশি তাই করো। শুনলে তো অনন্তকে ওখানে ফেলে রাখা যাবে না।

শোনো প্রমিতা। ধরা যাক, অনন্তকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু এই অবস্থায় সেটা তো তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতন একটা ব্যাপার। তারপর সুস্থ হয়ে সে যদি আর এখানে ফিরে আসতে না চায়? ধরো, আর এল না? তাহলে?

তাহলে কী? না এলে কী করা যাবে! ও ছাড়া কি আর কাজের লোক নেই? ওরকম আরও পাওয়া যাবে।

আমাকেও আমার অফিস থেকে যদি এইরকমভাবে কোনো দিন তাড়িয়ে দেয়? আমি চাকরি করি, সে-ও তো চাকরেরই কাজ। অনন্ত যেমন চাকর, আমিও তেমনি চাকর।

ফের ওইরকম বড়ো বড়ো কথা! তোমার একটুও প্র্যাকটিক্যাল সেন্স নেই। আর শোনো, তোমাকে আর-একটা কথা বলি। সবার সামনে ওদের অমনি চাকর চাকর বলবে না। শুনতে ভারি খারাপ শোনায়। আজকাল সবাই কাজের লোক বলে।

সবার সামনে কোথায় বললাম? শুধু তো তুমি আছ! তারপর আপনমনে সে বলল, ওরা কাজের লোক, আর আমরা অকাজের লোক।

রিন্টু একসময় এসে জিজ্ঞেস করল, বাবা, অনন্তদা সিঁড়ির তলায় শুয়ে কেন?

শৈবাল বলল, ওর অসুখ করেছে।

বাবা, জানো, সিঁড়ির তলায় ওই জায়গাটায় একদিন একটা তেঁতুলে বিছে বেরিয়েছিল, এই অ্যা-ত-তো বড়ো! অনন্তদাই দেখতে পেয়েছিল সেটা।

খবরের কাগজে চোখ নিবদ্ধ রেখে শৈবাল অন্যমনস্কভাবে বলল, তারপর?

অনন্তদা আমার পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে সেই জুতো দিয়ে বিছেটাকে চিপটে চিপটে মারল। একদম মারা গেল বিছেটা।

বাঃ বেশ!

বাবা, আর-একটা বিছে যদি অনন্তদাকে কামড়ে দেয়?

দেবে না।

যদি দেয়?

অনন্তদা ওখানে থাকবে না। আজই চলে যাবে।

কোথায়? অনন্তদা কোথায় চলে যাবে?

এবার শৈবাল এক ধমক দিয়ে বলল, তখন থেকে কেন আমায় বিরক্ত করছ? দেখছ না, কাগজ পড়ছি। সকাল থেকে মন দিয়ে কাগজ পড়ারও উপায় নেই। ব্যাগ গুছিয়েছ? স্কুলে যেতে হবে না?

ধমক খেয়ে রিন্টু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনন্ত ওর খেলার সঙ্গী। যেসব দিনে শৈবাল আর প্রমিতা একসঙ্গে সন্ধ্যের শো-তে ইংরেজি অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখতে যায়, বাবলি যায় নাচের স্কুলে, সেসব সন্ধ্যে বেলা রিন্টু অনন্তর তত্ত্বাবধানে থেকেছে! অনন্ত নানারকম খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে ওকে।

অনন্ত কোথায় যাবে, তার উত্তর তো শৈবাল নিজেই জানে না। সুতরাং ছেলেকে ধমক দেওয়া ছাড়া উপায় কী? তবে ধমকটা একটু বেশি জোরে হয়ে গেছে।

শৈবাল তাকিয়ে দেখল, অদূরে দাঁড়ানো প্রমিতার দু-চোখে জলভরা মেঘ।

বাড়িতে শৈবালের একটু প্রাণ খুলে রাগ করারও উপায় নেই। আগেই প্রমিতা কান্না শুরু করে দিয়ে জিতে যায়। খবরের কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে শৈবাল উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে একটা কিছু করতেই হবে।

শৈবাল মনে মনে আদর্শবাদী এবং মার্ক্সীয় মতে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সে ততখানি আদর্শবাদী কিংবা ততবেশি সমাজতান্ত্রিক নয় যে, গৃহভৃত্যের পক্স হলে তাকে নিজের বাড়িতে রেখে সেবা-শুশ্রূষা করবে, কিংবা তাকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে আসবে অফিস কামাই করে। অর্থাৎ সেও অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালির মতন একজন ভন্ড, মুখে যা বলে, কাজে তা করে না। কিংবা অন্যের যে-দোষ দেখে সে সমালোচনা করে, নিজেও ঠিক সেই দোষটিই করে।

কিছু টাকা দিয়ে যদি ব্যাপারটার একটা সুরাহা করা যেত, তাহলেই শৈবাল তার বিবেকের খোঁচাটুকু সামলে নিতে পারত। টাকা দিয়ে অনন্তকে কোথাও রাখা যায় না? অনন্তর মতন একজন বিশ্বাসী কাজের লোককে হারানোর প্রশ্নটাও তার মনে উঁকি মারছে। যতদিন পর্যন্ত আর-একটি এইরকম লোক পাওয়া না যায় ততদিন বাড়িতে শান্তি থাকবে না।

শৈবাল দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। সাধারণ হাসপাতালে পক্সের রুগি নেয় না। শৈবালের মনে পড়ল, তার অফিসের এক কলিগের ছেলের টিটেনাস হবার পর তাকে বেলেঘাটার দিকে একটা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। সেটার নাম আই ডি হসপিটাল। সেখানে ছোঁয়াচে রুগিদের নেয়।

শৈবাল আই ডি হসপিটালে ফোন করতে গেল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর, টেলিফোন লাইন যদিও-বা পেল, সেখান থেকে তার প্রশ্নের উত্তরে তাকে শুনতে হল ব্যঙ্গবিদ্রূপভরা এক বিচিত্র উত্তর।

কে একজন ভদ্রলোক বললেন, হাসপাতালে এমনিতেই তিলধারণের জায়গা নেই। নতুন রুগি নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া চাকরের চিকেন পক্স হয়েছে বলে শৈবাল তাকে হাসপাতালে ভরতি করতে চাইছে, এজন্য তার লজ্জা করে না? কলকাতার চতুর্দিকে এখন চিকেন পক্স হচ্ছে। এটা একটা বিরক্তিকর নিরীহ অসুখ। তবু সবাই যদি চিকেন পক্স হলেই হাসপাতালে থাকার বিলাসিতা করতে চায়, তাহলে সারাদেশে অন্তত এক হাজারটা নতুন হাসপাতাল খোলা দরকার।

শৈবাল দুম করে রেখে দিল ফোনটা।

এরপর তিনতলারই আর-একজন ভাড়াটে সুখেন্দুবাবু এসে বললেন, ও মশাই, আপনাদের চাকরের নাকি

শৈবাল বলল, যাচ্ছি যাচ্ছি, এখুনি ব্যবস্থা করছি।

দরজার কাছে এসে সে তিক্ত গলায় প্রমিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শুনুন সুখেন্দুবাবু, আজকাল চাকর বলতে নেই, বলবেন কাজের লোক। চাকর শুধু আমরাই, যারা অফিসে কাজ করি!

এ-রকম কথায় বেশ কাজ হল। সুখেন্দুবাবু কেটে পড়লেন তৎক্ষণাৎ।

দু-টি অ্যাসপিরিন-জাতীয় ট্যাবলেট খুঁজে বার করে, তারপর শৈবাল নিজেই এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে পা বাড়াল বাইরে।

প্রমিতা জিজ্ঞেস করল, ও কী, জল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

শৈবাল কোনো উত্তর দিল না।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে শৈবাল অনন্তর কাছে উবু হয়ে বসল। এই গরমের মধ্যেও অনন্ত একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। অন্য দিন এইসময় অনন্ত অনবরত ছুটোছুটি করে। ভোরে উঠেই দুধ আনা, তারপর বাজার করা, তারপর রিন্টু বাবলির খাবার। তাদের টিফিনের কৌটো গুছিয়ে দেওয়া, তারই মধ্যে শৈবালের জন্য ভাত

আজ এখন সে প্রায় অসাড়, নিস্পন্দ। মুখখানা কুঁচকে আছে।

শৈবাল আস্তে আস্তে ডাকল, অনন্ত, অনন্ত!

অনন্ত মুখ না ফিরিয়েই বলল, উঁ?

এখন কেমন আছিস?

উঁ?

কেমন আছিস? জ্বর কমেছে?

ব্যথা! গায়ে খুব ব্যথা।

নে, এই ওষুধটা খেয়ে নে।

ওষুধ দুটো আর জলের গেলাস নামিয়ে রেখে সে সরে গেল একটু দূরে। অনন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে ওষুধ ও জল খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। বেশ-একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করল শৈবাল। সে অনন্তকে নিজের হাতে সেবা করেছে।

অনন্ত শোন, তুই তো এখানে শুয়ে থাকতে পারবি না। এ-রকম অন্ধকার ঘুমোটের মধ্যে...তাতে আরও খারাপ হবে। তোর এখন কিছুদিন বিশ্রাম দরকার, চুপচাপ শুয়ে থাকা দরকার। এই অসুখের তো আর তেমন কোনো চিকিৎসা নেই, শুধু বিশ্রাম। তুই বরং ক-দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যা–এই অনন্ত!

অনন্ত যেন শুনতেই পাচ্ছে না, কোনো সাড়াশব্দ নেই।

শৈবাল একটু গলা চড়িয়ে ডাকল, এই অনন্ত! ওঠ। এবারে উঠে বোস।

এবার অনন্ত উঠে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে শৈবালের দিকে তাকাল। স্থিরদৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে কোনো রাগ, দুঃখ, অভিমান কিছুই নেই। নিছক ভাষাহীন, ম্লানভাবে চেয়ে থাকা চোখ দুটি ঈষৎ লালচে, ঘোলাটে।

কী বলছেন, দাদাবাবু?

তুই বাড়ি চলে যেতে পারবি না? যদি একটা রিকশায় তুলে দিই।

বাড়ি?

হ্যাঁ, তোর বাড়ি। ক-দিন বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নে। দেখবি, গ্রামের খোলামেলা হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবি। তোকে রিকশায় তুলে দেব এখান থেকে, তারপর বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পড়বি। কী রে পারবি না?

অনন্ত ঘাড় হেলাল।

শৈবাল আর দ্বিরুক্তি না করে দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে এক খামচা টাকা নিয়ে আবার নেমে এল নীচে। ভাগ্যিস মাসের প্রথম, তাই উটকো খরচ করা যায়।

অনন্তর এক মাসের অতিরিক্ত মাইনের সঙ্গে শৈবাল আরও দশ টাকা যোগ করল। একটু দ্বিধা করে আরও দশ। তারপর টাকাটা গোল্লা করে পাকিয়ে অনন্তর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শৈবাল বলল, নে, তোর সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে।

অনন্ত আবার চোখ বুজে ঝিম মেরে বসে আছে।

শৈবাল তাড়া দিয়ে বলল, নে নে, গুছিয়ে নে সব, আমি রিকশা ডেকে আনছি।

সকাল বেলা স্কুলের সময়টাতে ট্যাক্সির মতনই রিকশাও দুর্লভ। বেশিরভাগ রিকশাওয়ালার এইসময় বাঁধা কাজ থাকে। বালিগঞ্জ স্টেশন কাছেই, এক টাকার বেশি ভাড়া হয় না। দেড় টাকা কবুল করে শৈবাল ধরে আনল একজন রিকশাওয়ালাকে।

অনন্ত তখনও গোছগাছ করেনি দেখে শৈবাল মৃদু ধমক দিয়ে বলল, কী রে, চুপ করে আছিস যে? বাড়ি যাবি না? বললাম যে

অনন্ত বলল, ও-। তারপর সে হাত বাড়িয়ে কম্বল আর কাপড়চোপড় পুঁটলি করতে লাগল।

অন্যদিন অনন্ত কত চটপটে থাকে। আজ যেন তার হাত চলছেই না। তার গা থেকে যেন জ্বরের তাপ ঠিকরে বেরোচ্ছে। শৈবাল অনন্তর দিকে চেয়ে থাকতে পারছে না। তার গা শিরশির করছে।

যদি রিকশাওয়ালা চলে যায়! কিংবা অনন্ত মত বদলে ফেলে। শৈবাল আর ধৈর্য রাখতে পারছে না।

বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই তুই সেরে উঠবি। এই যে, ওষুধ দিলাম। দেখবি। ওতেই কাজ হয়ে যাবে।

অনন্তর মুখে কোনো কথা নেই। সে একা দাঁড়াল অতি কষ্টে।

অনন্তর টিনের সুটকেসটাও প্রমিতা নীচে রেখে গিয়েছিল, সেটা শৈবাল নিজেই তুলে দিল রিকশায়। অনন্তও নড়বড়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে রিকশায় উঠল।

রিকশাওয়ালারা পক্সকে বলে হৈজা। ওরা হৈজাকে খুব ভয় পায়! যদি বুঝতে পারত অনন্তর হৈজা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই রিকশাতে তুলতই না। এই রিকশাওয়ালাটি বোধ হয় একটু বোকা বোকা ধরনের, সে খেয়াল করল না অত কিছু। তাড়াতাড়ি করার জন্য সে ঠং ঠং শব্দ করতে লাগল অধীরভাবে।

শৈবাল অনন্তকে জিজ্ঞেস করল, কি রে যেতে পারবি তো?

মুখে কোনো উত্তরের শব্দ না করে অনন্ত ঘাড় হেলাল।

রিকশাওয়ালার দেড় টাকা ভাড়া শৈবালই দিয়ে দিল আগে। তারপর আরও দু-টি টাকা। রিকশাওয়ালার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ইসকা বোখার হ্যায়, ইসকো ট্রেনমে উঠা দেগা, সমঝা? হোড়া দেখভাল করনা?

যেটুকু বিবেকের খোঁচা অবশিষ্ট ছিল, তা ওই দু-টাকা দেওয়ায় একেবারে নির্মূল হয়ে গেল।

ব্যাপারটা যে এত সোজা, তা শৈবাল আগে বুঝতেও পারেনি। সে একটু বেশি বেশি বাড়িয়ে তুলছিল। সে ভেবেছিল, কেউ সঙ্গে করে পৌঁছে না দিলে অনন্ত যেতেই পারবে না। এই তো স্বেচ্ছায় অনন্ত দিব্যি চলে গেল। তাকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়াও হয়নি। ওরা গ্রামের লোক, ওরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারে।

অনন্ত রিকশাতে উঠেই ঘাড় কাত করে শুয়ে রইল এক পাশে। এই সব কাজের লোকেরা সবসময়ই ব্যস্ত থাকে বলে, এদের নির্জীব অবস্থায় দেখলে যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। শৈবাল এর আগে কোনো ঝি-চাকরের অসুখ দেখেনি। তার কেমন যেন ধারণা ছিল, ওদের অসুখ হয় না। সবসময় এক্সসারসাইজ করে কিনা।

ছেলেটা আবার ফিরে আসবে তো? সত্যিই কাজের ছেলে ও।

ভালো হয়ে গেলে চলে আসিস কিন্তু?

রিকশাটা চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে হুস করে একটা ফিয়াট গাড়ি এসে থামল এই বাড়ির সামনে। আর-একটু হলে রিকশাটাকে ধাক্কা মেরে দিচ্ছিল আর কী।

গাড়ি চালাচ্ছে ইরা।

পিছনের দরজা খুলে দিয়ে ইরা ব্যস্তভাবে বলল, নাম, নাম, শিগগির কর।

শৈবাল যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। ইরার গাড়ি থেকে নামছে হেনা নামের সেই মেয়েটি, তার হাতে কাপড়ের পোঁটলাপুটলি!

সেই মেয়েটি নামতে-না-নামতেই ইরা আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে!

ইরার সবসময়ই ব্যস্তসমস্ত ভাব। সর্বক্ষণই যেন ছুটছে।

কাছে এগিয়ে এসে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

ইরা দারুণ ছটফট করে বলল, একদম সময় নেই, এখন নেমে কথা বলতে পারছি না…প্রমিতাকে বলবেন দুপুরে ফোন করব, তখন সব জানাব, ও মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে রাখা যাবে না। ওকে এখানে রেখে গেলাম…ওঃ, দেরি হয়ে গেছে, ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট…পরে সব জানাব, চলি।

যেমন এসেছিল, তেমনিই দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল ফিয়াট গাড়িটা।

শৈবালের ইচ্ছে হল, সেখানে দাঁড়িয়েই হুর রে বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

এক মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! শৈবালের মতন নাস্তিককেও তো তাহলে দেখেছি ভগবানে বিশ্বাস করতে হয়।

# ৭-৮. সমাজতান্ত্রিক শৈবাল

সেদিন শৈবাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরল, গোরুর মাংস নিয়ে নয়, একবাক্স কেক নিয়ে। তার মেজাজটা খুব ফুরফুরে আছে আজ।

আজ তার মদ খাওয়ার জন্য ক্লাবে কিংবা তাসের আড্ডায় যেতে ইচ্ছে হয়নি। মনটা খুব উদার হয়ে গেছে, সে ঠিক করেছে সন্ধ্যেটা সে একান্তই নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে কাটাবে। নানান ব্যস্ততার জন্য সে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বেশি কথাবার্তাও বলতে পারে না। এটা ঠিক নয়। রিডার্স ডাইজেস্টের একটা প্রবন্ধে সে পড়েছে যে, একালের বাবা-মায়েরা, ছেলে-মেয়েদের জন্য বেশি সময় দেয় না বলেই সামাজিক সমস্যা এত বাড়ছে।

আজ সকালে সে ছেলেকে বকেছে। সেটা অনুচিত।

এক-একদিন পর পর ভালো ঘটনা ঘটতে থাকে। আবার যেদিন খারাপ কিছু দিয়ে শুরু হয়, সেদিন শুধু খারাপই চলে। আজ সকালে গোড়ার দিকটা খুবই গোলমেলেভাবে শুরু হয়েছিল, তারপর অনন্তর ব্যাপারটা সমাধান করার পর থেকেই কিছু ভালো হয়ে গেল। অফিসে অনেক দিনের একটা পেণ্ডিং কেস অপ্রত্যাশিতভাবে মীমাংসা হয়ে গেছে আজ।

তা ছাড়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাকে আগামী মাসে একবার নেপাল ঘুরে আসতে বলেছেন। ঘুরে আসলেই বেশ কিছু পয়সা পকেটে আসে। এমনকী, ইচ্ছে করলে শৈবাল প্রমিতা আর ছেলে মেয়েদেরও নিয়ে যেতে পারে নেপালে বেড়াতে। ওই অফিসের খরচেই হয়ে যাবে। সামনের মাসে ছেলে-মেয়েদেরও স্কুলের ছুটি পড়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে শৈবাল দেখল, হেনা নামের মেয়েটি কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নাঘরে রান্নায় মেতে গেছে। আর প্রমিতা তাকে শেখাচ্ছে।

রান্না করতে ভালো না-বাসলেও রান্না শেখাবার ব্যাপারে প্রমিতার খুবই উৎসাহ। প্রত্যেকবার নতুন রান্নার লোক এলে নতুন করে শেখাতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রমিতার রান্না শেখাবার প্রধান অঙ্গ অবশ্য কী করে রান্নাঘর পরিষ্কার রাখতে হয়, সেই প্রণালী মুখস্থ করানো। রান্নায় নুন কম হোক কিংবা বেগুন ভাজতে গিয়ে পুড়ে যাক, তাতে খুব-একটা আপত্তি নেই প্রমিতার, কিন্তু রান্নাঘরের মেঝে ভিজে স্যাঁৎসেতে হয়ে থাকলে কিংবা তরকারির খোসা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে থাকলেই সে রেগে আগুন হবে।

শৈবালকে দেখেই প্রমিতা বলল, তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি আসছি। চা খাবে তো?

ঠিক অফিস ছুটির পরই শৈবাল আজ বাড়ি ফিরেছে বলে প্রমিতা খুব খুশি। পুরুষমানুষ একবার বাড়ি থেকে বেরোলে আর সহজে ফিরতে চায় না।

ঝট করে গা-টা ধুয়ে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে ফেলল শৈবাল। তার চা ঢাকা দিয়ে রাখা আছে শোয়ার ঘরের বেডসাইড টেবিলে। প্রমিতা আগেই চা খেয়ে নিয়েছে। তার সময় নেই, তাকে এখন থাকতে হবে রান্নাঘরে। অনন্ত নাকি রান্নাঘরটা একেবারে নরককুন্ড করে রেখে গেছে, সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার না করলেই নয়।

চা খাওয়ার পর শৈবালের হঠাৎ খেয়াল হল সে সিগারেট আনতে ভুলে গেছে। অফিস থেকে ফেরার পথে সে ভেবেছিল, পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে কিনে নেবে।

সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, অনন্ত। অনন্ত!

রান্নাঘর থেকে প্রায় ছুটে এসে প্রমিতা জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

সিগারেট নেই, সিগারেট আনতে হবে, অনন্তকে একটু পাঠাবে?

অনন্তকে তুমি কোথায় পাচ্ছ?

ফট করে শৈবাল লজ্জা পেয়ে গেল। সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। সিগারেট ফুরিয়ে গেলেই অনন্তর নাম ধরে চেঁচানো তার অভ্যেস।

পড়া ছেড়ে উঠে বসে রিন্টুও বলল, অনন্তদাদা তো নেই। চলে গেছে।

এবার ছেলেকে আর না বকুনি দিয়ে, তার দিকে চেয়ে একগাল হেসে শৈবাল বলল, হ্যাঁ রে, একদম ভুলে গিয়েছিলুম। আমার কীরকম ভুলোমন দেখেছিস! যা, তুই পড়তে যা।

বাবা, অনন্তদাদা আর আসবে না?

হ্যাঁ, কেন আসবে না? অসুখ সেরে গেলেই আসবে।

রিন্টুকে কাছে ডেকে শৈবাল আদর করে হাত বুলিয়ে দিল তার চুলে। এটা তো বেশ পিতা হিসেবে তার দায়িত্বের পরিচয় দেওয়া হল। সন্তানদের শুধু বকাবকি করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে হয়। শৈবালের কি তা ইচ্ছে করে না, নিশ্চয়ই করে। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া অফিসের জন্য কী তার সময় পাওয়া যায়?

রিন্টু পড়ার ঘরে ফিরে গেলে শৈবাল বলল, ওই মেয়েটিকে দিয়ে সিগারেট আনানো যায় না, না?

প্রমিতা বলল, কেন, তুমি গিয়ে সিগারেট আনতে পারছ না? তুমি আজকাল বড্ড কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছ কিন্তু।

প্রমিতার বোধ হয় ধারণা, শৈবাল সারাদিন অফিসে কুঁড়েমি করে এসেছে।

শৈবাল বলল, মেয়ে কাজের লোক নিয়ে এই এক অসুবিধে, যখন-তখন বাইরে পাঠানো যায় না। সিগারেট-ফিগারেট আনতে গেলে...।

প্রমিতা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, কী অদ্ভুত বাংলা। অফিসে সবসময় ইংরেজি বলতে বলতে তোমরা একদম বাংলা-টাংলা গুলিয়ে ফেলেছ?

কী ভুল বললাম?

মেয়ে কাজের লোক আবার কী? কাজের মেয়ে বলতে পার-না?

ওঃ হো, তাই তো! কাজের মেয়ে তা, এ-মেয়েটি সত্যিই কাজের তো?

স্বভাবটা নরম আছে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

ইরা ওকে ফেরত দিয়ে গেল হঠাৎ?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। দুপুর থেকে তিন-চার বার ওকে ফোন করার চেষ্টা করলাম, একবারও বাড়িতে পাচ্ছি না।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করোনি?

ও তো কিছুই বলতে পারছে না। খালি বলছে, আমি কিছু জানি না। ওবাড়ির দিদিমণি আজ সকালে হঠাৎ বললেন, তুই জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে, তোকে ওই দিদিমণির বাড়িতে রেখে আসব। কেন বললেন, তাও জানি না। বিশ্বাস করুন আমি কী দোষ করেছি, তাও জানি না।

ইরা আবার ওকে ফেরত নিতে আসবে না তো?

নিতে এলেই বা দিচ্ছে কে? বাবাঃ, লোক পাওয়া যা ঝঞ্ঝাট!

কাল সন্ধ্যেয় অন্তত সাত জায়গায় টেলিফোন করেছি! এই মেয়েটিকে রাখার আর-একটা কী বড়ো সুবিধে জানো?

কী?

ওকে ছুটি-ফুটি দিতে হবে না একদম। ও বলছিল, ও গ্রামে আর যেতে চায় না। গ্রামে গেলে খেতে পাবে না। ওর বাবাটা পাষন্ড, টাকা-ফাকা সব কেড়ে নেবে!

মেয়েটি গ্রামে গেলে খেতে পাবে না, সুতরাং ছুটিও নেবে না, এটা একটা সুবিধেরই ব্যাপার বটে।

শৈবালের একবার লোভ হল প্রমিতাকে খোঁচা দিয়ে দু-একটা মন্তব্য করতে। তারপরই মনে পড়ল, আজ সন্ধ্যেটা অন্যরকম।

প্রসঙ্গ পালটে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, কেক এনেছি, ছেলে-মেয়েদের দিলে না?

প্রমিতা বলল, ওরা বিকেল বেলা একগাদা ফুচকা-মুচকা খেয়েছে। বাড়িতে ডেকে এনেছিল। কেকগুলো থাক, কাল ওদের টিফিনে দিয়ে দেবো। তুমি সিগারেট আনতে গেলে না? আমি কিন্তু চললুম রান্নাঘরে।

শৈবাল বলল, সিগারেট কিনতে গিয়ে যদি চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আর সে যদি টানতে টানতে অন্য কোথাও নিয়ে যায় আড্ডা মারার জন্য?

প্রমিতা তার নরম ডান হাতের মুঠিতে ছোট্ট কিল পাকিয়ে বলল, আজ সেরকম কিছু করলে তোমায় এমন মারব।

আজ এপরিবারে চমৎকার সুখ ও শান্তি।

শৈবাল বেরোবার মুখে প্রমিতা আবার বলল, ঠিক এক্ষুনি ফিরবে। আজ শুধু সেদ্ধভাতে ভাত, গরম গরম খেয়ে নিতে হবে। আর শোনো, দুটো মিষ্টি পান এনো তো!

সিগারেট কিনতে গিয়ে সত্যিই এক বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শৈবালের। অরুণ আর মার্থা।

ওরা শৈবালকে দেখে বলল, এই যে, তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলাম।

আজ শৈবাল পুরো সন্ধ্যেটা নিজের পরিবারের জন্য উৎসর্গ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আজ এইরকম কেউ না এসে পড়লেই ভালো হত। কিন্তু ওরা অনেক দিনের বন্ধু, শৈবালকে হাসতেই হল কৃত্রিম হাসি।

মার্থা গড়গড় করে সমস্ত বাংলা কথা বলতে পারে, যদিও উচ্চারণ যাচ্ছেতাই।

ওদের নিয়ে শৈবাল ফেরার পর প্রমিতা দরজা খুলতেই মার্থা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, প্রমিটা, ইউ মাস্ট হেলপ মি। আমার ডারুণ বিপড! এমন অসুবিডায় পড়েসি।

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, আরে আগে বসতে দাও, ঢুকতে-না-ঢুকতেই

মার্থা বলল, ডেকেচো, ডেকেচো! অরুণ শুধু হাসে। আমাকে কোনো শাহাজ্যো করেনা।

কারুর বিপদের কথা শুনলেই প্রমিতা খুব ঘাবড়ে যায়। সে ভুরু তুলে বলল, কী হয়েছে?

মার্থা বলল, আমাডের কাজের লোক আবার পালিয়েসে?

শৈবাল আর প্রমিতা চোখাচোখি করল।

অরুণ আর মার্থা দু-জনেই চাকরি করে। ওদের একটি চার বছরের ছেলে আছে, ওরা দুই জনেই বেরিয়ে গেলে ছেলেকে কারুর কাছে তো রেখে যেতে হবে। বিশ্বাসী লোক দরকার।

প্রমিতাই অনেকবার ওদের জন্য কাজের লোক ঠিক করে দিয়েছে। আগে ওরা ছেলের বদলে শুধু মেয়ে চাইত। এখন আবার মত বদলে গেছে, মেয়ে চাই না, ছেলে চাই! কিন্তু ওদের বাড়িতে কাজের লোক বা কাজের ছেলে বেশি টেকে না। ওদের বাড়ির ম্লেচ্ছ পরিবেশ হয়তো বেশি দিন সহ্য করতে পারে না তারা। অরুণদের বাড়িতে নিয়মিত গাঁজা খাওয়ার আসর বসে। অল্পবয়েসি আলোকপ্রাপ্ত এবং আলোকপ্রাপ্তা তরুণ-তরুণীরা সেই আসরে যোগ দেয় এবং বাউল গান ও নিগ্রো স্পিরিচুয়ালস বিষয়ে আলোচনা করে।

শেষপর্যন্ত অরুণ তার এক দূর-সম্পর্কীয়া বয়স্কা আত্মীয়াকে এনে রেখেছিল। আসলে বাড়ির দাসী, কিন্তু তাঁর নাম মাসি। তিনিও নাকি গতকাল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কে জানে, কাশীর দিকে রওনা হয়েছেন কি না!

অন্যান্য আমেরিকানদের মতন মার্থাও নাকি সুরে কথা বলে। কিন্তু কোনো আমেরিকান যে অনবরত শুধু ঝি-চাকর বিষয়ে আলোচনা করতে পারে, তা মার্থাকে না দেখলে শৈবাল বিশ্বাসই করতে পারত না। শৈবালের এমন একটি দিনও মনে পড়ে না, যেদিন মার্থা ওই বিষয়ে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলেছে। অথচ শৈবালের ধারণা, আমেরিকায় ঝি-চাকরের প্রচলন নেই।

এইসময় হেনা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মার্থার উদ্দেশ্যে বলল, ভালো আছেন বউদি?

কাজের লোক বা কাজের মেয়েদের এই এক স্বভাব। যে-বাড়ি থেকে তাদের কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছে বা যে-বাড়িতে তাদের রাখেনি, সে-বাড়ির লোকদের দেখলেও তারা হাসিমুখে কথা বলে।

হেনাকে দেখে আনন্দে, বিস্ময়ে মার্থার সারামুখ, চোখ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন সমুদ্রে ডুবন্ত কোনো মানুষ একটি ভাসমান ভেলা দেখতে পেয়েছে!

টুমি! টুমি অ্যাখুনো এখানে আস? টুমি চলে যাওনি?

তারপরই মার্থা প্রমিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, প্রমিতা টুমি অ্যাটো ডিন ওকে রেকে দিয়েসো? হাউ নাইস অব ইউ! আ-অ্যাম ভে-র-রি, ভে-র-রি গ্রেটফুল টু ইউ।

প্রমিতা নিরস ঠাণ্ডা গলায় বলল, ও এখন আমাদের এখানে কাজ করে।

মার্থা একেবারে আঁতকে উঠল। যেন, হাত থেকে সেই ভেলাটা আবার কেউ কেড়ে নিচ্ছে!–ও নো। বাট হোয়াই! টোমার টো কুব বালো একটা কাজের লোক আসে। টুমি ডু জনকে রাকটে চাও? কাম নাও, প্রমিটা! ইউ আর বিকামিং আ বুরঝয়া।

অরুণ আপন মনে সিগারেটে গাঁজা পাকাতে শুরু করেছে। যেকোনো জায়গায় গেলেই এটাই তার প্রথম কাজ। শৈবাল মুচকি মুচকি হাসছে।

প্রমিতার গলার স্বর গম্ভীর। সে বলল, দু-জন লোক রাখব কী করে? আমাদের আগের লোকটি চলে গেছে।

মার্থা বলল, সেই ছেলেটি? অনন্ট? সে টো খুব বিশ্বাসী কাজের লোক সিল!

প্রমিতা বলল, চলে গেছে। প্রমিতা মিথ্যে কথা বলে না। টেকনিক্যালি এটাও অবশ্য মিথ্যে নয়। অনন্ত নিজে থেকেই তো রিকশায় চেপে চলে গেছে। তাকে তো জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

মার্থা শেষ চেষ্টা করে বলল, প্রমিটা টুমি ওনেক লোক পাবে, টুমি এই মেয়েটিকে আমায় ডাও। আমার খুব ডোরকার।

গলায় কোনো কৌতুক নেই, তবু রসিকতার চেষ্টা করে প্রমিতা বলল, শোনো, তুমি একবার ওকে ফেরত দিয়ে গেছ। আর তুমি ওকে চাইতে পার না। আমাদের বাংলায় এটাই নিয়ম। আমি তোমাকে অন্য লোক খুঁজে দেব।

ওদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই যেন, প্রমিতা চায়ের সঙ্গে কেকের বাক্সটাও রাখল ওদের সামনে। শোকে-দুঃখে মার্থা তিন-চারখানা কেক খেয়ে ফেলল। অরুণ ততক্ষণে সিগারেটভরা গাঁজায় কয়েক টান দিয়ে ফেলেছে, সে এবার দার্শনিক আলোচনা শুরু করবে। ওরা উঠল রাত দশটায়।

যাওয়ার সময় মার্থা বেশ কয়েকবার লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে গেল হেনার দিকে। সাম্রাজ্য গ্রাসের দিন আর নেই, নইলে মার্থা বোধ হয় হেনাকে ধরে নিয়ে যেত।

ওরা চলে যাওয়ার পর শৈবাল বলল, যাক।

প্রমিতা হেনাকে ডেকে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, তোর কি ওদের বাড়িতে কাজ করার ইচ্ছে ছিল? তুই ওদের ওখানে যেতে চাস?

হেনা বলল, না বউদি। আমি এখানেই থাকব, আমি আর কোথাও যাব না।

তাহলে তুই ওদের সামনে অত ঘুর ঘুর করছিলি কেন?

হেনা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, মেমসাহেব তো, কীরকম করে যেন বাংলা কথা কয়, তাই শুনতে ভালো লাগে!

শৈবাল হো হো করে হাসতে গিয়েও থেমে গেল। কে জানে, প্রমিতা আবার কী মনে করবে।

ঠিক সেইসময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

শৈবাল রিসিভার তুলল। ওপাশে ইরার গলা।

খুব কোমল বিনীত গলায় ইরা বলল, আপনি তখন নিশ্চয়ই কিছু মনে করেছেন, গাড়ি থেকে নামিনি, ভালো করে কথা বলিনি, আমার নামা উচিত ছিল।

না না, তাতে কী হয়েছে।

আসলে ব্যাপার কী জানেন, আজ আমার সারাদিন এত কাজ, এমন টাইট প্রোগ্রামে...সকাল বেলা ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তারপর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা আরম্ভ আজ থেকে, ঠিক সময় উপস্থিত থাকতেই হবে, নাওয়া-খাওয়ার সময় পাইনি, দুপুরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনার। তারপর বাড়ি ফিরতে-না-ফিরতেই...ছটার সময় আমার মেয়ের নাচের স্কুলে একটা ফাংশান, সেখানে না গেলে খারাপ দেখায়, সেখান থেকেই আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা পার্টি, বাইরে থেকে কয়েকজন সাহেব এসেছে

ইরা এমনভাবে বলছে যেন, এই প্রত্যেকটি কাজই ওর কাছে বিড়ম্বনাবিশেষ। অথচ এইসব প্রত্যেক জায়গাতেই ও যেতে ভালোবাসে। এর কোনো একটা জায়গায় ওকে নেমন্তন্ন না করলে ও অপমানিত বোধ করে। এতসব কান্ড করেও ইরা বেশ হাসিখুশি থাকতে পারে।

শৈবাল জিজ্ঞেস করল, প্রমিতাকে দেব?

হ্যাঁ, দিন-না!

প্রমিতা ইশারায় জিজ্ঞেস করল, কে?

শৈবালও কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে ওষ্ঠের ভঙ্গি করে জানাল, ইরা!

হেনা কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

প্রমিতা তাকে বলল, এই, তুই রান্নাঘরে গিয়ে খাবার-টাবার গরম কর তো!

এরপর প্রমিতার সঙ্গে ইরার এক দীর্ঘ সংলাপ শুরু হল।

ইরা বলল, তোকে সারাদিন ফোন করতে পারিনি, এমন ব্যস্ত ছিলাম আমি, ডাক্তারদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তারপর...ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রমিতা বলল, আমিও তোকে ফোন করেছিলাম দু-বার–

হ্যাঁ, জানি, শুনেছি। কিন্তু বিকেলে বাড়ি ফিরেই..ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও মা, তোর মেয়ের আজ নাচের ফাংশান ছিল বুঝি? ওইটুকু মেয়ে কেমন নাচল? আমরা খবর পেলুম না, তাহলে আমরাও দেখতে যেতাম...কেমন নেচেছিল কাবেরী?

প্রমিতা ইচ্ছে করেই যেন হেনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। ইরাও সরাসরি কোনো কথা বলে না।

প্রায় মিনিটদশেক অন্যান্য বিষয় আলোচনা হওয়ার পর ইরা বলল, ভাই প্রমিতা, সত্যি করে বল, তুই আমার ওপর রাগ করিসনি? সত্যি, আমি খুব লজ্জিত!

প্রমিতা নিরীহ ভাব করে বলল, কেন, রাগ করব কেন? কী হয়েছে?

সকাল বেলা দুম করে মেয়েটাকে তোদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলাম! এটা আমাদের খুবই অন্যায়, তোর কাছ থেকে কাজের লোক নিয়ে আবার তোর কাছেই ফেরত পাঠানো। অরুণ মার্থার মতন আমি জানি ওরা যখন-তখন এসে তোকে জ্বালাতন করে, আমি কিন্তু মোটেই তা চাইনি, আমি মেয়েটাকে বলেছিলাম, ওর গ্রামে পাঠিয়ে দেবো...কিন্তু ও গ্রামে যেতে চায় না, ও নাকি একলা একলা এখনও ট্রেনে চাপেনি, ওর সঙ্গে কারুকে যেতে হবে, কিন্তু আমি আর কাকে পাঠাই বল, তাই বাধ্য হয়েই তোর ওখানে।

ঠিক আছে, তাতে কিছু হয়নি।

তুই রাগ করিসনি? অন্য কোথাও কাজ জোগাড় না-হওয়া পর্যন্ত তোকেই তো ওকে খাওয়াতে হবে, তা ছাড়া রাখাটাও একটা প্রবলেম, ওই বয়েসি মেয়েকে যেখানে-সেখানে শুতে দেওয়া যায় না।

প্রমিতা ঢোক গিলে বলল, ওকে এখন কিছুদিন আমার কাছেই রাখব ঠিক করেছি।

তুই দু-জনকে রাখবি! কক্ষনো রাখিস না..না...না, আমি খরচের জন্য বলছি না। তোর কাজের ছেলেটি আর ওই মেয়েটি। কী যেন নাম, হেনা? হ্যাঁ হেনা, ওরা কাছাকাছি বয়েসি, তোরা যখন বাড়িতে থাকবি না...শেষকালে একটা কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়বি। ডায়মণ্ড হারবারে লক্ষ করিসনি? ওরা দু-জনে যেন সবসময় কাছাকাছি থাকতে চায়, না, না, আমি তোকে বলছি, প্রমিতা...

আমাদের অনন্ত কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। আজই বাড়ি চলে গেছে।

তাই নাকি? ইরা উল্লাসের চিৎকারে টেলিফোন যন্ত্রটা আর-একটু হলেই ফাটিয়ে ফেলেছিল আর কী! তাহলে তো তোকে এমনিতেই লোক খুঁজতে হত, যাক, তাহলে তোর ভালোই হল বল।

হ্যাঁ, তুই না জেনে আমার উপকার করে ফেলেছিলি।

যাক, আমার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। সারাদিন এমন খারাপ লাগছিল। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই বেশ ভালো রে। নম্র, কথা শোনে, আমি রাখতে পারলুম না, আমার উপায় নেই।

কেন কী হয়েছিল?

সে এক লজ্জার ব্যাপার। মেয়েটার কিন্তু কোনো দোষ নেই। ওর একমাত্র দোষ এই যে, ওর বয়েস কম, ওর শরীরে যৌবন আছে!

সেটা দোষের কেন হবে?

সেই তো বলছি? ওর কোনো দোষ নেই! দোষ আমাদের

এরপর ইরা টেলিফোনেই ফিসফিস করতে লাগল। মোটকথাটা হল এই যে, ইরার এক মামাতো ভাই সোমনাথ কিছুদিন হল এসে আছে ওদের বাড়িতে। ছেলেটি লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করে, ছ-মাসের একটা ট্রেনিং কোর্সের জন্য থাকতে হবে কলকাতায়। সেই সোমনাথ এখনও বিয়ে করেনি, তার জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। সোমনাথ অত ভালোছেলে হলেও প্রায়ই একটু-আধটু ড্রিংক করে। সে তো আজকাল অনেকেই করে, এমনকিছু দোষের নয়। কিন্তু সোমনাথের মারাত্মক একটি দোষ আবিষ্কৃত হয় হয় দু-দিন আগে।

ইরাদের বাড়িতে ঝি-চাকরদের ব্যবহারের জন্য একতলায় একটা বাথরুম আছে, বাড়ির পেছন দিকে গ্যারেজের পাশে। তিনতলার ঝুল-বারান্দায় একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়ালে

যে, সেই বাথরুমটির ভেতরটা দেখা যায় তা আগে কেউ জানত না। পরশুদিন সোমনাথকে সেখানে গভীর মনোযোগর সঙ্গে একদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইরার খটকা লেগেছিল। সোমনাথের মুখ চোখের চেহারাই তখন অন্যরকম।

যাক, তখন ইরা সোমনাথকে কিছু বলেনি।

গতকাল সকালেও সোমনাথকে ছাদের ঠিক সেই জায়গাটায় সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তখন ইরা আবার তিনতলারই অন্য একটি ঘরের জানলা দিয়ে লক্ষ রাখে সোমনাথের ওপর। একটু পরেই একতলার বাথরুম থেকে ভিজে কাপড়ে হেনাকে বেরোতে দেখে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল ইরার কাছে। তার অন্তরাত্মা অবশ্য ছি ছি করে ওঠেনি। ইরা বিদুষী মেয়ে, সে জানে, ফ্রয়েড বলেছেন, অনেক পুরুষমানুষের লোভ থাকে নিম্নজাতীয় মেয়েদের ওপর। ঝি, মেথরানি, গয়লানিদের প্রতি তারা বেশি করে যৌন আকৃষ্ট হয়। কত সুন্দরী ভালো পরিবারের মেয়ে সোমনাথকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। অথচ সোমনাথের ওইরকম নজর!

তখনও সোমনাথকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি ইরা। ভেবেছিল, অন্য কোনো সময় তাকে আকারে-ইঙ্গিতে নিষেধ করে দেবে।

হেনাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল ইরাদের বাড়ির চারতলার চিলেকোঠায়। কাল রাত বারোটার পর বাড়ির সবাই যখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, তার কিছু পরে খুট করে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল ইরা। ইরার এমনিতেই সহজে ঘুম আসে না। তার ঘুম খুব পাতলা। শব্দ শুনে সে নিঃশব্দে বাইরে এসে দেখে সোমনাথ সিঁড়িতে পা টিপে টিপে চার তলার ছাদের দিকে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। ইরা অমনি বাইরের আলো জ্বেলে ডেকেছিল, সোমনাথ।

সোমনাথের মুখ-চোখ ঠিক যেন তখন পাগলের মতন। ইরাকে দেখে যেন সে ভূত দেখল। তারপর দৌড়ে নেমে ঝড়ের বেগে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

আজ সকালে অবশ্য সোমনাথ ইরার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, কিন্তু এরপর আর হেনাকে এবাড়িতে রাখা যায় না। হেনার কিছু দোষ নেই, তবুও।

ইরা প্রবলভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। যেকোনো নির্যাতিতা-রমণীর হয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত। সে বার বার বলতে লাগল, হেনার কোনো দোষ নেই, দোষ সোমনাথের চরিত্রের বিশেষ একটি দিকের, ফ্রয়েড যা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু হাজার হোক, সোমনাথ তার মামাতো ভাই, তাকে তো আর বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা যায় না? তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি হবে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই হেনাকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিতে হল।

ইরা প্রমিতাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, যেন সে, একথা আর কারুকে না বলে। এমনকী শৈবালকেও না। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই, তারা পেটে কথা রাখতে পারে না। শৈবাল যদি অন্যদের আবার বলে...! সোমনাথের খুব শিগগিরই বিয়ে দিতে হবে, তাহলেই ওই দোষ কেটে যাবে।

টেলিফোন সংলাপ শেষ হল ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট পর। আরও পাঁচ মিনিট চললেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

হেনা আলু, বেগুন, ডিমসেদ্ধ সমেত ফেনাভাত গরম করে টেবিলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, তা এতক্ষণে জুড়িয়েও প্রায় বরফ।

প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না প্রমিতা। শয়নকক্ষে শৈবালের জেরার চোটে ইরার বাড়িতে হেনা বিষয়ক সব ঘটনা তাকে বলতেই হল। অবশ্য, সেও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল। শৈবাল যেন কিছুতেই অন্য কারুকে না বলে।

প্রমিতার ভুরুতে সামান্য দুশ্চিন্তার রেখা দেখে শৈবাল তার স্ত্রীর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে, হাতজোড় করে বলল, হে দেবী, ফ্রয়েড সাহেব যা-ই বলুন-না কেন, দাসী, গোয়ালিনি, মেথরানি জাতীয় স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র লালসা নেই। তুমি যখন বাড়ি থাকবে না, কিংবা যখন বাপের বাড়ি যাবে, তখনও আমি হেনার প্রতি কু-দৃষ্টি দেব না। আমি ট্যুরে গেলে তুমি যেমন অনন্তর সঙ্গে সেরকম কিছু করোনি, সেইরকম আমিও হেনার সঙ্গে... সুতরাং ওকে রেখে দাও, আর যেন লোক খুঁজতে না হয়। প্রমিতা শৈবালের গালে একটা আলতো চাঁটি কষিয়ে দিয়ে বলল, এমন অসভ্যের মতন কথা বল। ওই সোমনাথ ছেলেটি যেন কেমন কেমন, সব মেয়েদের দিকেই কীরকম যেন গিলে খাওয়ার মতন করে তাকায়।

তোমার দিকেও সেরকমভাবে কখনো তাকিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

তাহলে ফ্রয়েডের থিয়োরি ওর সম্পর্কে খাটল না। ছেলেটি দেখা যাচ্ছে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ একটি কামুক। একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে এই যা।

তুমি চুপ করো। আলো নেভাবে না? ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছে একেবারে। সারাদিন যা টেনশান গেছে

মাঝরাত্রে আপনি আপনি ঘুম ভেঙে গেল শৈবালের। শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি, ছটফটানি। মনে হয়, প্রত্যেকটি রন্ধ্রে ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখ দুটিতে জ্বালা জ্বালা ভাব।

নিজের কপালে হাত বুলিয়েই টের পেল তার বেশ জ্বর এসেছে! নাকের ডগায় একটা কী যেন! ফুসকুড়ি না?

উঠে আলো জ্বেলে শৈবাল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে দাঁড়াল। শুধু নাকের ডগায় নয়, ডান ভুরুর ওপরেও আর-একটা ফুস্কুড়ি উঠেছে। কোনো সন্দেহ নেই। চিকেন পক্স তাকেও ছুঁয়েছে।

আলো নিভিয়ে বিছানায় ফিরে যেতে যেতে শৈবাল ভাবল, তার এই ব্যাপারটাই যদি আগের রাত্রে হত, তাহলে আজ সকাল বেলা অনন্তকে অমনভাবে বিদায় করে দেওয়ার দরকার হত না।

প্রমিতাকে ডাকল না শৈবাল। কিন্তু সারারাত তার আর ঘুম এল না।

.

## ০৮.

পরদিন সকাল বেলা হল রিন্টুর। বিকাল বেলা হিমাংশুবাবুর মেয়ের। এরপরের চারদিনের মধ্যেই এ-বাড়ির সব কটা ফ্ল্যাটেই এক জন দু-জন করে চিকেন পক্সে শয্যাশায়ী। প্রথম প্রথম হিমাংশুবাবু খুব হম্বিতম্বি করে বলেছিলেন যে, শৈবালদের ফ্ল্যাটের কাজের লোক অনন্তর জন্যই আজ গোটাবাড়িটার সব কটি পরিবারের এমন দুর্ভোগ। অনন্তকে সিঁড়ির নীচে শুইয়ে রাখার মতন এমন অন্যায় কাজও কেউ করে?

কিন্তু এক তলার ভাড়াটে শরবিন্দুবাবুর ভালোমানুষ স্ত্রী, এবাড়ির সকলের সুধা বউদি নিজে থেকেই স্বীকার করলেন যে, তাঁর দেওর পাটনা থেকে এই অসুখ নিয়ে এসেছে অনন্তরও আগে। তাকে অতি যত্নে মশারির মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, সেইজন্য কেউ জানতে পারেনি। তা ছাড়া, পাড়ায় অনেক বাড়িতেই হয়েছে। গোটা কলকাতায় এ-বছর চিকেন পক্সের এপিডেমিকের অবস্থা। সুতরাং বিশেষ কোনো একজনকে দায়ী করার কোনো মানে হয় না।

রিন্টু খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেও তারপর পড়ল বাবলি। শৈবাল ভুগল বেশ কিছুদিন। তার পরও শরীর দুর্বল। অফিস থেকে ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা তার বাধ্য হয়েই গেল, কিন্তু মোটেই উপভোগ করতে পারল না। জিভ বিস্বাদ। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। সিগারেট টানতে গেলে বমি এসে যায়। মাঝখান থেকে তার নেপাল ট্যুরটা ক্যানসেল হয়ে গেল।

প্রমিতারও হয়নি, হেনারও হয়নি। এই সময়টায় হেনা খাটল প্রাণ দিয়ে। প্রমিতাকে কিছু দেখতে হয়নি, হেনা একাহাতে সব করেছে। প্রমিতার বাপের বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত হেনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শৈবাল আর প্রমিতা মাঝে মাঝে আলোচনা করে যে, এবার যদি অনন্ত ফিরে আসে, তাহলে কী হবে? হেনাকে ছাড়াবার আর প্রশ্নই ওঠে না। অনন্তকেই-বা কী বলা হবে?

শৈবাল ভাবে, অনন্ত কি সত্যিই আর ফিরে আসবে? অসুস্থ অবস্থায় তাকে এই বাড়ি থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল...এতদিনে তার সেরে যাওয়ার কথা। তারপরই সে প্রমিতার সঙ্গে অন্য বিষয়ে কথা বলে। কেন যেন, অনন্তর কথা মনে পড়লেই তার অস্বস্তি হয়।

প্রমিতা বলে, আমি ভাবছি আর কখনো ছেলে রাখব না। মেয়েই ভালো। শোয়ার ঝামেলা নেই। আমাদের ছোটো ফ্ল্যাট। হেনার শোয়ার জায়গার সত্যিই ঝামেলা নেই। সে রিন্টু আর বাবলিদের ঘরের মেঝেতেই বিছানা পেতে শুয়ে থাকে। তাতে সুবিধে হয়েছে এই যে, রিন্টু মাঝরাতে রোজ একবার করে বাথরুমে যায়। আগে সে মাকে ডাকত, কেন-না, বাথরুমের আলোর সুইচটাতে তার হাত যায় না। এখন সে হেনাকে ডেকে তোলে।

প্রমিতার মাঝে মাঝে কোমরে ব্যথা হয়। সব মেয়েরই যেমন হয়। এখন সেরকম ব্যথা উঠলে হেনা যত্ন করে প্রমিতার কোমর টিপে দেয়। অনন্তকে দিয়ে তো আর একাজ করানো যেত না।

শৈবাল তবু জিজ্ঞেস করে, কিন্তু অনন্ত এলে কী বলবে? তাকে তো ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, আমি ছুটি নেওয়ার কথা বলেছিলাম

প্রমিতা বলে, অনন্ত এলে ওকে অন্য কারুর বাড়িতে দিয়ে দেব। ওর মতন কাজের ছেলেকে পেলে যে-কেউ লুফে নেবে।

মাসখানেক পর সকলেই আবার সুস্থ স্বাভাবিক হল, শৈবাল অফিসে যেতে শুরু করল।

হেনা এখন সংসারের সব কাজ এমনই শিখে নিয়েছে যে, প্রমিতা তার ওপর স্কুলফেরত ছেলে-মেয়েদের খাবার খাওয়ানোর ভার দিয়ে সেই সময়টায় ফ্রেঞ্চ শিখতে যায়। এবং মাঝে মাঝেই বান্ধবীদের সঙ্গে মিটিং করে অবসর সময় কাটাবার জন্য সে বাচ্চাদের একটি স্কুল খোলার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। সেটা অবশ্য কোনো দিনই কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শৈবাল অফিসের বন্ধুদের পার্টি-টার্টিতে পরস্ত্রীদের সঙ্গে খানিকটা ফষ্টিনষ্টি করে বটে কিন্তু সে বাড়িতে একেবারে গৃহী-সন্ন্যাসী। হেনাকে সে নারী বলেই গণ্য করে না! হেনা ভিজে কাপড়েই থাকুক কিংবা তার বুক থেকে আঁচল খসে পড়ুক, সেদিকে শৈবাল একবারের বেশি দু-বার তাকায় না কখনো।

এ বাড়িতে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে হেনার স্বাস্থ্যটি বেশ ভালো হয়েছে। গায়ের রং মাজা, মুখটা মন্দ নয়, হঠাৎ দেখলে ঝি বলে মনেই হয় না।

ইরা এবং অরুণ, মার্থা মাঝে মাঝেই আসে। প্রমিতার মুখে হেনার গুণপনার কথা শুনে প্রকাশ্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা। দু-টি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কারণে হেনাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল তারা। তাদের দুটি পরিবারেই যথারীতি কাজের লোক নিয়ে দারুণ সমস্যা চলেছে। ইরার বাড়ি অত্যন্ত অগোছালো। দামি দামি জিনিস এখানে-সেখানে পড়ে থাকে, তার বাড়িতে এক-একজন কাজের লোক বা কাজের মেয়ে আসে, দু-তিনদিন পরই, তারা কিছু-না-কিছু চুরি করে পালায়। ইরার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে

ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের পর সস্ত্রীক সোমনাথ লণ্ডন যাবে। তার ঝি-আসক্তির কথা জানাজানি হয়নি। বোধ হয় এতদিনে সে নিজেও ভুলে গেছে সেকথা।

মার্থা আগের মতনই নাকিসুরে অভিযোগ জানায়। তার বাড়িতে কারুকে না ছাড়িয়ে দিতে হয় ঝাল রান্নার জন্য, কেউ-বা গোরুর মাংস দেখে ঘেন্নায় নিজে থেকেই পালায়। যত বলি জাল ডেবে না, লঙ্কা একডম ডেবে না, টবু থিক ডেবে! বেংগোলিয়া কি লোঙ্কা চারা কোনো কিসু রাঁডটে জানে না?

অরুণ অবশ্য একটু ঝাল রান্নাই ভালোবাসে। মেমবউয়ের পাল্লায় পড়ে আ-ঝালি, সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার খেতে সে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু অন্য কোনো বাড়িতে খেতে গেলেই সে কাঁচা লঙ্কা চেয়ে নেয়।

ইদানীং মার্থার আবার কাজের লোকের দারুণ সংকট চলছে। এক সপ্তাহ ধরে তাদের কেউ নেই। তাই সে ঘন ঘন আসছে প্রমিতার কাছে। তবে প্রমিতার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জটাও এখন বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। ঝি-চাকর আর পাওয়াই যায় না। অথচ সারাদেশে নাকি এখনও খেতে পায় না বহুলোক।

দু-মাস কেটে গেছে। অনন্ত ফিরে আসেনি। অর্থাৎ সে আর আসবে না। সে কি অভিমান করে এল না? নাকি দেশেই থেকে গেল?

এবাড়িতে কেউ আর অনন্তর নাম উচ্চারণ করে না। রিন্টুও এর মধ্যে ভুলে গেছে। অনন্তর একজোড়া চটি পড়েছিল পেছনের বারান্দায়, প্রমিতা একদিন জমাদার ডেকে সে চটিজোড়া ফেলে দিতে বলল।

শৈবালের একটা কাজ বেড়েছে আজকাল। বাজার করতে হয়। হেনাকে দিয়ে আর সব কিছুই হয়, কিন্তু বাজার করাটা সুবিধের হয় না। অনন্ত চমৎকার গুছিয়ে বাজার করত। দু-চার পয়সা সে চুরি করত কি না কে জানে। কিন্তু প্রমিতা খবরের কাগজের বাজার-দর পড়ে দেখত, অনন্ত ঠিক একই দাম বলে সব জিনিসের।

আর হেনা গ্রামের মেয়ে হলেও মাছ চেনে না একেবারেই। বেশি পয়সা দিলেও সে যা-তা মাছ নিয়ে আসে।

শৈবাল বাজার করা একদম পছন্দ করে না। শৈবালের ধারণা, সে অফিসে প্রচুর পরিশ্রম করে টাকাপয়সা রোজগার করে আনে বলে, বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তার আলস্য বিলাসিতা করার অধিকার আছে। কিন্তু রোজ রোজ আর কাঁহাতক পচা মাছ কিংবা কাঁটাভরা বাটামাছ খাওয়া যায়? বাধ্য হয়েই হিমাংশুবাবুর মতন ভোরে উঠেই চা খাওয়ার আগে বাজার যেতে হয় তাকে। অবশ্য সে পাজামার ওপর পাঞ্জাবি পরে। এবং বাজারে হিমাংশুবাবুকে দেখলে সে দূর থেকে এড়িয়ে যায়।

দাদাবাবু।

বাজার থেকে ফেরার পথে একদিন শৈবাল যেন সকাল বেলাতেই ভূত দেখল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে অনন্ত। তারও হাতে ভরতি বাজারের থলে। সত্যি সত্যি ভয়েই কেঁপে উঠেছিল শৈবাল। অনন্ত যদি এখন তাকে একটা গালাগালি দেয় কিংবা মারার চেষ্টা করে! সে কী করবে?

অনন্ত টিপ করে শৈবালের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অত্যন্ত লাজুক বিনীত গলায় বলল, ভালো আছেন দাদাবাবু?

শৈবালের গলা শুকিয়ে গেছে। তারই তো অনন্তকে জিজ্ঞেস করার কথা যে, সে ভালো কি! শৈবাল কিছু বলতে পারল না। একটা অপরাধবোধ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

রিন্টু, বাবলি, বউদি, সব ভালো আছেন তো?

এবার শৈবাল কোনোক্রমে বলল, হ্যাঁ। তুই কেমন আছিস?

ঠিক ডানপাশের বাড়িটার দিকে হাত দেখিয়ে অনন্ত বলল, আমি এখন এই বাড়িতে কাজ করি।

শৈবালের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কিংবা আক্রোশ দেখাবার বদলে অনন্ত মুখে এমন একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল, যেন সেই অপরাধী।

তারপর যেন, কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরেই সে বলল, আমি তখন দেশে যাইনি। বালিগঞ্জ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে শুয়েছিলাম। এবাড়ির ডাক্তারবাবু বাড়িতে নিয়ে এলেন।

শৈবাল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। দেশে সত্যিকারের দয়ালু, মানবহিতৈষী লোক আছে তাহলে। রেলস্টেশন থেকে একজন বসন্তের রোগীকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করেছেন। পরমুহূর্তেই সে ভাবল, কিংবা এমনও হতে পারে, ওই ডাক্তারটিরও বাড়িতে কোনো কাজের লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা মোটামুটি ভদ্র চেহারার ছোকরাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার মানুষ, ভালো করেই জানে যে, চিকেন পক্স এমন কিছু ভয়ের অসুখ নয়।

অনন্ত আবার বলল, আমি এখন এই ডাক্তারবাবুর চেম্বারে কাজ করি।

শৈবাল চোখ তুলে ডাক্তারটির সাইনবোর্ড দেখল, অনন্তর পদোন্নতি হয়েছে তাহলে। সে আর চাকর নয়। ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট। রুগিদের স্লিপ নিয়ে ডাক্তারের টেবিলে দিয়ে আসে। ডাক্তারবাবু আসবার আগে চেম্বারটা পরিষ্কার করে রাখে! অনন্ত লেখাপড়াও জানে কিছুটা।

একবার আসিস আমাদের বাড়িতে, একথা বলতে গিয়েও বলল না শৈবাল। যেন তার অধিকার নেই একথা বলার।

সামান্য কিছু বিড় বিড় করে সে, অনন্তর কাছ থেকে বিদায় নিল।

বাড়ি ফিরে সে খুবই নাটকীয় উত্তেজনার সঙ্গে খবরটা জানাল প্রমিতাকে।

প্রমিতার মধ্যে বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তার নিজের এখন ভালো কাজের লোক আছে, পুরোনো লোকেরা কে কোথায় কাজ করে তা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

ছেলে-মেয়েরাও, একবারও বলল না, অনন্তকে ফিরিয়ে আনবার কথা। অথচ ওদের সঙ্গে খুবই ভাব ছিল অনন্তর।

তারপর থেকে প্রায়ই অনন্তর সঙ্গে দেখা হয় শৈবালের। সে যখন বাজারে যায়, তখনও ওই ডাক্তারের চেম্বার খোলার সময় হয় না। অনন্ত সেই সময়টা চেম্বারের দরজা খুলে ঝাড় পোঁছ করে। শৈবালের সঙ্গে চোখাচোখি হলে শ্রদ্ধা ও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাসে অনন্ত। একদিন শৈবালের বাজারের থলি থেকে একটা জ্যান্ত কইমাছ লাফিয়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়, অনন্তই ছুটে এসে তুলে দিয়েছিল মাছটা। শৈবাল জ্যান্ত কইমাছ ধরতে ভয় পায়। দেখা যাচ্ছে, অনন্ত এখনও পুরোনো মনিবকে খাতির করে।

সুখের নিয়মই এই যে, তা মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে পড়ে।

শৈবালদের সুখের সংসারেও ফাটল দেখা দিল আবার। চার-পাঁচ-মাস কাটতে-না কাটতেই প্রমিতার কাছ থেকে আবার হেনা সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে হল শৈবালকে।

একদিন প্রমিতা বলল, যাই-ই বলো, গ্রাম থেকে ভালো মানুষটি সেজে এলেও এখানকার ঝানু ঝি-চাকরদের সঙ্গে মিশে দু-দিনেই ওরা সেয়ানা হয়ে ওঠে।

শৈবাল বলল, ঝি-চাকর বলছ যে? তুমিই না বলেছিলে–

এখানে তো আর কেউ শুনছে না।

কী করেছে ও? কাজ তো ভালোই করে।

তা করে। কিন্তু একটাই ওর প্রধান দোষ, একবার বাইরে গেলে কিছুতেই আর ফিরতে চায় না। কোথায় থাকে কে জানে? আজকাল সকালে চা দিতে কত দেরি করে দেখেছ?

ভোরে দুধ আনতে গিয়ে ফেরে দেড় ঘণ্টা বাদে। বলে কিনা, মস্ত বড় লাইন। এতদিন লাইন ছিল না, আমার আগের লোকেরা সবাই আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসত, আর এখনই লাইন বড়ো হয়ে গেল? শুনলে বিশ্বাস করা যায়?

শৈবাল বলল, হুঁ!

কাল ওকে এক প্যাকেট মাখন কিনতে পাঠালাম, ফিরল ঠিক দু-ঘণ্টা পরে। আমি তো চিন্তায় মরি! গাড়িচাপা পড়ল না কি! আমাদের রাস্তাটা যা খারাপ! ও মা, সেসব কিছুই হয়নি, হেলতে দুলতে ফিরল।

কেন দেরি হল জিজ্ঞেস করলে না?

বলল, মাখন পায়নি।

মাখন পাইনি তো এত দেরি?

সেইকথাই তো বলছি। ওকে যত জিজ্ঞেস করি কোনো উত্তর দেয় না। আজকাল কেমন যেন উদাস ভাব। কথা বললে মন দিয়ে শোনে না।

হুঁ।

আমার কী মনে হয় জানো। ও কোনো আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশছে। চেহারাখানা তো খোলতাই হয়েছে বেশ! আজেবাজে গুণ্ডা বদমাশরা ওর দিকে নজর দেবেই। আর ও মেয়েটাও তো বোকা।

হুঁ।

হুঁ হুঁ করছ কী? আমার তো একটা কথা ভেবে ভয়ই ধরে গেছে। এই ধরো, গত রোববার আমরা চন্দননগর গেলাম, সারাদিন কেউ বাড়িতে ছিলাম না; ওর ওপর সব কিছুর ভার

দিয়ে গেছি, ও যদি সেরকম কোনো আজেবাজে লোককে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকায়...একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে পড়তে হবে না।

তা করবে না, মেয়েটা এমনিতে ভালো।

ভালো হলেই-বা, বোকা যে। তা ছাড়া এই বয়েসে

একটা কথা বলব?

কী?

শৈবাল ভালো করে সিগারেটে টান দিয়ে প্রমিতার চোখে চোখ রেখে বলল, হেনার একটা বিয়ে দিয়ে দাও।

বিয়ে?

হ্যাঁ। এই বয়েসেই গ্রামের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। শুধু গ্রামের মেয়ে কেন, ওর তো একুশ-বাইশ বছর বয়েস...ঝি-চাকরের কাজ করলেও ওদেরও তো একটা শরীরের ক্ষুধা আছে। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। ওর যৌবন এসেছে, ও-ও তো কোনো পুরুষমানুষকে চাইবেই। আর কোনো পুরুষমানুষ যদি ওকে চায়, তাহলে ওই-বা আকৃষ্ট হবে না কেন? সেইজন্যই বলছি, ওর একটা সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্য একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।

ওর বিয়ে আমরা দেব কী করে? ওর বাবা এসে কী বলবে-না-বলবে।

ও তো গ্রামে নিজের বাবার কাছে ফিরতে চায় না শুনেছি।

আর-একটা কথা, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ও নিজেই একদিন বলেছিল যে, খুব কম বয়েসে ওর বাবা জোর করে একজন বুড়োর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল! ওদের সমাজে বিয়েতে মেয়ের বাবা টাকা পায়। ওর সেই বর অবশ্য বিয়ের তিন-চার মাস বাদেই মারা গেছে। ও আসলে বিধবা।

বিদ্যাসাগরমশাই বিধবা বিবাহ আইন পাস করে গেছেন বহুদিন আগে!

প্রমিতা এবার রাগত সুরে বলল, বেশ তো, তুমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করো। তোমার যদি অত গরজ থাকে।

শৈবাল চুপ।

প্রমিতা আবার বলল, ওর বিয়ে হলে ও আর আমাদের বাড়িতে কাজ করবে?

অনেক বিবাহিতা মেয়েও তো কাজ করে দেখেছি।

সে শুধু ঠিকের কাজ। তারা বাড়িতে থাকে না। যাদের বর নেয়-না কিংবা অন্যরকম গোলমাল আছে তারাই শুধু বাড়িতে থেকে কাজ করে।

শুধু আমাদের এখানে কাজ করবে বলেই ওই মেয়েটি সারাজীবন বিয়ে করতে পারবে না?

বেশ তো, টাকা পয়সা জোগাড় করে তুমি যদি ওর বিয়ে দিতে পার–

শৈবাল আবার চুপ।

ঝি-চাকরের কাজ যারা করে তাদেরও দেহের ক্ষুধা আছে, তাদের একটা সুস্থ সামাজিক জীবন দিতে গেলে ঠিক সময়ে বিয়ে হওয়া উচিত, এটা শৈবাল বিশ্বাস করে। কিন্তু সে নিজে উদ্যোগী হয়ে জোগাড় যন্ত্র করে এই হেনার মতন কোনো মেয়ের বিয়ে দেবে, এ শৈবালের পক্ষে সম্ভব নয়। তার সময় কোথায়? অফিসের কাজ আছে-না? যেসব অফিস ভালো মাইনে দেয়, তারা নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বোম্বে ট্যুর থেকে ফিরলে তাঁকে রিসিভ করার জন্য রোববার সকালেও শৈবালকে ছুটতে হয় এয়ারপোর্টে।

এর দু-দিন পর প্রমিতা আবার রাত্তির বেলা চোখ বড়ো বড়ো করে শৈবালকে বলল, আজ কী হয়েছে জানো?

শার্ট, প্যান্ট, জাঙিয়া ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েও শৈবাল ওয়ার্ডরোবে পাজামা খুঁজে পেল না। সে ঠিক সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, আগে তোমার কথাটা বলে নাও, তারপর পাজামাটা খুঁজে দিয়ো।

শৈবাল যে জায়গাটা খুঁজেছিল, ওয়ার্ডরোবের ঠিক সেই জায়গাটাতেই হাত দিয়ে ম্যাজিকের মতন একটা পাজামা বার করে আনল প্রমিতা। সেটা শৈবালের শরীরের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, রিন্টু-বাবলিকে হেনার কাছে রেখে আমি ফ্রেঞ্চ ক্লাসে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম হেনা নেই। কিছু বলে যায়নি ওদের। কোনো রকমে খাবারটা দিয়ে চলে গেছে। ফিরল আমি ফেরারও এক ঘণ্টা পরে। জিজ্ঞেস করলে কিছু উত্তর দিল না। এমন আস্পর্ধা হয়েছে!

শৈবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, এবার এবাড়ি থেকে হেনার পাট উঠল। দু চারদিনের মধ্যেই প্রমিতা ওকে তাড়াবে।

তাড়াতে আর হল না, তার পরদিনই হেনা উধাও হয়ে গেল। সন্ধ্যে বেলা কী একটা ছুতো করে সে বেরিয়েছিল, রাত্রে আর ফিরে এল না। ভদ্রলোকেরা যেমন কথায় কথায় প্রেমে পড়ে, ওদের মধ্যে কি সেরকম প্রেম চালু আছে? বেঁচে থাকার তাগিদটাই ওদের জীবনে প্রধান নয়?

কিংবা স্বাস্থ্যবতী অথচ বোকা মেয়ে হেনা হয়তো পড়েছে লম্পট গুণ্ডাদের পাল্লায়। তারা ওর যৌবন লুটে পুটে নিয়ে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখনও যদি ছিটেফোঁটা যৌবন অবশিষ্ট থাকে, তাহলে হেনা নাম লেখাবে কালীঘাটে কিংবা সোনাগাছির বেশ্যাপল্লিতে আর যদি চেহারাটা একেবারে ভাঙাচোরা হয়ে যায় তাহলে পাঁচ বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ নিয়ে পেট চালাবে।

ডাক্তারের চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে শৈবাল এই সব সাত-পাঁচ ভাবে। হেনা কিংবা অনন্ত চলে যাওয়ার ফলে তার বাড়িতে খুবই গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু ওরা দু-জনে যদি জীবনে সুখী হয়...।

ডাক্তারবাবুটির কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি হয়তো অনন্তকে চাকরি থেকে তাড়ানোর আসল কারণটি বলে দিতে পারেন, কিন্তু শৈবাল জিজ্ঞেস করতে চায় না। যদি ব্যাপারটি সত্যি এ-রকম নিষ্ঠুর হয়। নিষ্ঠুর ঘটনার মুখোমুখি হতে চায় না শৈবাল।

তার বদলে মাঝে মাঝে সে একটি দৃশ্য কল্পনা করে। হেনাকে বিয়ে করে অনন্ত ফিরে গেছে সুন্দরবনে তার নিজের বাড়িতে। মাতলা নদীর ধারে ছবির মতন ছোট্ট একটি মাটির বাড়ি। সামনের খানিকটা জমিতে বেগুন আর লঙ্কাগাছ। রান্নাঘরের দু-পাশে একটি গোয়ালঘর আর একটি ধানের গোলা। কিছু দূরে মাঠে হাল, বলদ আর লাঙল নিয়ে অনন্ত চাষ করছে নিজের জমিতে। আকাশ-ছাওয়া বৃষ্টিভরা কালো মেঘ। বাড়ির সামনের জায়গাটায় শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে স্বাস্থ্যবতী হেনা জল দিচ্ছে বেগুন গাছগুলোর গোড়ায়। সে গুনগুন করে গাইছে একটা পল্লিগীতি। একটা এক বছরের শিশু ধুলোবালি মেখে খেলছে মাটিতে আর খলখল করে হাসছে। হেনা মাঝে মাঝে গান থামিয়ে ছেলের দিকে তার ঘামেভেজা মুখটি ফিরিয়ে বলছে, দাঁড়া তো রে দুষ্টু, দেখাচ্ছি তোকে–

এই মনোরম দৃশ্যটি কল্পনা করে আদর্শবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক শৈবাল ভারি তৃপ্তি পায়।